সেই দিন সেই রাত্রি

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রকাশন বিভাগ
৮/১ সি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রকাশক :
দুলাল বল
৮/১ সি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ঝুলন পূর্ণিমা, ১৩৫৮

প্রচ্ছদ : গৌতম রায়

মুদ্রক :
শ্রীরণজিৎকুমার মণ্ডল
লক্ষ্মীজনার্দন প্রেস
৬, শিবু বিশ্বাস লেন
কলিকাতা-৬

দাউদ হায়দার

প্রিয়বরেষু।

॥ ১ ॥

ট্যাক্সি থেকে নেমে, বাড়ির দরজা দিয়ে ঢোকার সময় একটু ভয় হল সুকুমারের। ভয়টা মায়ার জন্য। সঙ্গে জিয়া রয়েছে, যদি ওর সামনেই হঠাৎ মেজাজ গরম করে ফেলে মায়া! জিয়া বেচারি কী মনে করবে?

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সে জিয়াকে বলল, সাবধান, রেলিংটার ওপর বেশী জোর দিও না। রেলিংটা একটু নড়বড়ে আছে, বাড়িওয়ালাকে বলেছি, সারিয়ে দিচ্ছে না কিছুতেই।

জিয়া লাজুক চোখে সুকুমারের দিকে তাকাল। কথা বলল না।

সুকুমারের ফ্ল্যাট তিনতলায়। দরজার সামনে এসে কলিংবেল টিপতে গিয়ে সুকুমারের ভয়টা আরও বাড়ল। ভয়ের থেকেও লজ্জাটাই বেশী। মায়ার মেজাজ ঠিক থাকে না, যখন তখন রেগে যায়। মায়া যখন রেগে গিয়ে চ্যাঁচামেচি শুরু করে, তখন অন্য কেউ বুঝবেই না যে আসলে মায়ার মনটা খুব নরম। জিয়া তো নতুন ছেলে, কিছুই জানে না।

দরজা খুলে দিল বাড়ির চাকর নন্দু।

সুকুমার ভেতরে ঢুকে বসবার ঘরের পর্দা তুলে জিয়াকে বলল, তুমি বস, আমি আসছি এক্ষুনি।

সুকুমার শোওয়ার ঘর, খাওয়ার ঘর খুঁজে দেখল। মায়াকে পেল না।

নন্দুকে ডেকে সুকুমার ভীতু ভীতু গলায় জিজ্ঞেস করল, বৌদি কোথায় রে?

বেরিয়েছে নাকি?

নন্দু বলল, বৌদি বাথরুমে।

সুকুমার বসবার ঘরে আবার ফিরে এল। সন্ধ্যে হয়ে এসেছে, এই সময় মায়া রোজ একবার গা ধুয়ে নেয়। যেদিন মেজাজ ভাল থাকে, সেদিন বাথরুমে গুণ গুণ করে গান গায়। আজ গান গাইছে না।

সুকুমার জিয়াকে জিজ্ঞেস করল, তুমি চা খাবে ?

জিয়া টেবিল থেকে একটা পত্রিকা তুলে নিয়ে পাতা ওল্টাচ্ছিল, মুখ তুলে বলল, আপনি যদি খান এখন, আমিও খেতে পারি।

সুকুমার গলা চড়িয়ে বলল, নন্দু, দু'কাপ চা কর তো।

ইচ্ছে করেই সে একটু জোরে চ্যাঁচালো, যাতে বাথরুম থেকে মায়া শুনতে পায়। দু'কাপের কথা শুনে মায়া নিশ্চয়ই বুঝতে পারবে যে তার সঙ্গে বাইরের লোক আছে। ব্যাপারটা আরও সরল করার জন্য সে আবার বলল, বৌদি যদি খায়, তিন কাপই কর।

মানসিক অস্থিরতা সুকুমার ঠিক দমন করতে পারছে না। বসে বসে পা নাচাচ্ছে। ঝোঁকের মাথায় সে জিয়াকে সঙ্গে নিয়ে এসেছে। এক একবার মনে হচ্ছে, না আনলেই হত। আবার জোর করে সে নিজেকে বোঝাচ্ছে।

এনেছি, বেশ করেছি। প্রত্যোকেরই একটা দায়িত্ব আছে।

বিকেলবেলা অফিস থেকে ফেরার পথে সুকুমার গিয়েছিল অনুপমের বাড়িতে। অনেকদিন যায় নি। সেখানে গিয়ে দেখল বাড়িটা প্রায় হোটেল হয়ে গেছে। দশ বারোটা নতুন ছেলে। ওদের রান্নাঘরের পাশের বারান্দায় একটা বড় উনুন পাতা। সেখানে একটা বড় কেটলিতে চায়ের জল চাপানো হয়েছে। এতগুলো কাপ নেই, তাই চা খাওয়া হল মাটির খুরিতে। বেশ আড্ডা গল্প-গুজবে জমে গিয়েছিল সুকুমার।

কিন্তু একটা ব্যাপারে তার মনের মধ্যে প্রথম থেকেই খচ্-খচ্ করছিল। এরা সকলে রাত্তিরেও থাকে অনুপমের বাড়িতে, দু' বেলা

খায়। এতগুলো লোকের খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করাটা তো কম খরচের ব্যাপার নয়! অনুপমের মাত্র দু'খানা ঘর, তার মধ্যে একটিতে থাকে অনুপমরা স্বামী-স্ত্রী, অন্যটিতে গাদাগাদি করে দশ বারোজন। মাটিতে ঢালাও সতরঞ্চি পাতা, তার ওপর এখানে-সেখানে ছড়ানো কয়েকটা বালিশ। এই তো বিছানা—রাত্তিরে ছেলেগুলোকে নিশ্চয়ই খুব মশা কামড়ায়।

অনুপম পড়ায় একটা কলেজে। কতই বা মাইনে পায়। কিন্তু অনুপম বরাবরই পাগলাটে দিলদরিয়া ধরনের মানুষ। ভবিষ্যতের কথা কক্ষনো চিন্তা করে না। নিশ্চয়ই দু'হাতে টাকা ধার করছে।

অনুপমের তুলনায় সুকুমার অনেক সাবধানী।

সুকুমার এক ফাঁকে অনুপমকে জিজ্ঞেস করেছিল, এতগুলো ছেলেকে তুই কতদিন রাখতে পারবি? এ যে অসম্ভব ব্যাপার!

অনুপম কথাটা বিশেষ গায়ে না মেখে বলল, যতদিন চলে চলুক, তারপর একটা কিছু ব্যবস্থা হয়ে যাবে!

—কী ব্যবস্থা হবে?

—তুই বলছিস, কিছু হবে না?

—না, সে-কথা নয়। তবু তোর একার পক্ষে—

—বন্ধু-বান্ধবদের বলেছি, যদি কেউ জায়গা দেয়। কলকাতা শহরে জায়গা পাওয়া তো শক্ত—কারুর বাড়িতেই বেশী ঘর নেই।

সুকুমারের মনে এলো, তার ছাদের ঘরটা এখন খালি পড়ে আছে। ঐ ঘরটায় তার ছোট ভাই বিজন থাকতো। বিজন মাত্র দু' সপ্তাহ আগে চাকরি পেয়ে দিল্লী চলে গেল। ঘরে একটা খাট পাতা আছে, চেয়ার-টেবিল আছে। যদিও ছোট ঘর, তবু একজন দু'জন অনায়াসে থাকতে পারে।

সুকুমার তখুনি ঝোঁকের মাথায় বলে ফেলল, আমার বাড়িতে এদের দু' একজনকে নিয়ে যেতে পারি।

অনুপম দু'এক মুহূর্ত তাকিয়ে রইল সুকুমারের চোকের দিকে। তারপর জিজ্ঞেস করল, তোর স্ত্রীর অসুবিধে হবে না ?

—তোর স্ত্রীর যদি অসুবিধে না হয়, তা হলে মায়ারই বা কেন অসুবিধে হবে ?

—তোর স্ত্রীর তো···

—তা হলেও ঠিক চালিয়ে নেব।

সুকুমারের স্ত্রী মায়া সাত মাসের গর্ভবতী। এই অবস্থায় বেশী পরিশ্রম করা উচিত নয়। বাড়িতে দু'একজন অতিথি থাকলে মায়াকে খাটতেই হবে খানিকটা।

কিন্তু সুকুমার যখন একবার প্রস্তাবটা দিয়ে ফেলেছে, আর ফেরাতে পারে না।

সে বারবার বলতে লাগল, কোন অসুবিধে হবে না, কোন অসুবিধে হবে না !

অনুপম তার অনেকদিনের বন্ধু। অনুপমের খানিকটা ভার লাঘব করা কি তার পক্ষে উচিত নয় ?

অনুপম বলল, ঠিক আছে, তুই একজনকে নিয়ে যা। আরও কয়েকজন জায়গা দেবে বলে কথা দিয়েছে—সুতরাং আস্তে আস্তে সবারই ব্যবস্থা হয়ে যাবে।

অনুপমই জিয়ার নাম বললে। তাকে ডেকে জিয়ার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, এ ছেলেটা বড্ড লাজুক, দলের সঙ্গে ঠিক খাপ খাওয়াতে পারে না !

সুকুমার জিয়াকে ভালো করে দেখল। উনিশ কুড়ি বছর বয়েস সুন্দর চেহারা, লম্বা দো-হারা। ধারালো নাক ও চিবুক, কিন্তু চোখ দুটিতে খুব সরল ভাব।

সুকুমার বলেছিল, তোমাকে ভাই আমি তুমিই বলছি, আমার থেকে তো বয়েসে অনেক ছোট ? তুমি আমাদের বাড়িতে গিয়ে থাকবে ? একটা আলাদা ঘর পাবে।

জিয়া সঙ্গে সঙ্গে রাজি।

বিনীত ভাবে বলেছিল, তাহলে তো আমার অনেক সুবিধা হয়। আমার একটু পড়াশুনা করার ইচ্ছা, কিন্তু এখানে এত গোলমালের মধ্যে পড়াশুনা করতে পারি না।

জিনিসপত্তরের মধ্যে জিয়ার আছে শুধু একটা কাঁধে ঝোলানো ব্যাগ। সেটা নিয়ে সে চলে এসেছে সুকুমারের সঙ্গে।

নন্দু চা দিয়ে গেছে। মায়া এখনো বাথরুম থেকে বেরোয় নি। একটা চায়ের কাপ জিয়ার দিকে এগিয়ে দিয়ে সুকুমার বলল, তোমার ঘরটা ছাদের ওপর তো, তাই একটু বেশী গরম লাগবে—যদিও পাখা আছে, কিন্তু দুপুরে খুব গরম, তোমার একটু অসুবিধে হবে।

জিয়া বলল, আলাদা একটা ঘর, তাই তো যথেষ্ট। অসুবিধা আর কি!

—তোমার কোন কিছুর দরকার টরকার হলে চেয়ে নেবে। লজ্জা করবে না!

জিয়া একটু হাসল।

বাথরুমের দরজায় ছিটকিনিতে টং করে একটা শব্দ হতেই সুকুমার উঠে দাঁড়াল। বলল, আমি এক্ষুনি আসছি।

মায়া শোওয়ার ঘরের আয়নার সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। শায়া আর ব্লাউজের ওপর শাড়িটা আলাগা করে জড়ানো।

সুকুমার পেছন দিক থেকে এসে মায়ার ফর্সা ভিজে ঘাড়ের ওপর ঠোঁট রাখল।

মায়াকে মুখ ফেরাতে হল না, আয়নার মধ্যেই সে স্বামীর মুখ দেখতে পাচ্ছে।

আয়নার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, বাইরের ঘরে কে এসেছে?

—বলছি। তার আগে বল, রাগ করবে না?

—রাগ করব কেন ?

—আগে কথা দাও, রাগ করবে না !

—কী, ব্যাপারটা কী ?

—আমি একটি ছেলেকে নিয়ে এসেছি, আমাদের এখানেই কিছুদিন থাকবে !

মায়ায় ভুরুটা কুঁচকে গেল। তাতে রাগের বদলে বিস্ময়ই বেশী।

—আমাদের এখানে থাকবে ? জায়গা কোথায় ?

—ওপরে বিজনের ঘরটা তো এখন খালিই পড়ে আছে।

—কতদিন থাকবে ?

—এই কিছুদিন, যতদিন না অন্য আর একটা ব্যবস্থা হয়—

—কোথা থেকে এসেছে ছেলেটি ?

—অনুপমের বাড়িতে দশ বারোজন আশ্রয় নিয়েছে। সে বেচারা একা কি করে এতজনকে সামলাবে ? তাই বন্ধুবান্ধবরা সবাই দু' একজন করে নিজেদের বাড়িতে নিয়ে যাচ্ছে !

—পূর্ব পাকিস্তানের ছেলে ?

—হ্যাঁ। খুব ভালো ছেলে। লাজুক, আর খুব ঠাণ্ডা স্বভাব. চট করে এসো, তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।

মায়ার ভুরু আবার সোজা হয়ে গেছে। চুলে চিরুনি চালাতে চালাতে বলল, তুমি যাও, আমি একটু পরে আসছি।

সুকুমারের মনটা হালকা হয়ে গেছে। মায়া দপ করে জ্বলে ওঠেনি। সেইটুকুই যথেষ্ট।

সুকুমার আবার বসবার ঘরে ফিরে এল। চা ঠাণ্ডা হয়ে গেছে। এক চুমুকে সেটা শেষ করে বলল, আমি খানিকটা বাদে একবার বেরুব। তুমি তোমার ঘরে থাকতেও পারো, ঘুরে টুরেও আসতে পারো। এদিককার রাস্তা ঘাট মোটামুটি চিনে গেছ তো ?

—এখনো ভাল চিনি না।

—আমাদের বাড়ি থেকে বেরিয়ে খানিকটা দূরে যে একটা বড় পানের দোকান, সেইখানেই বাস স্টপ। ন' নম্বর আর পাঁচ নম্বর বাস যায়—এই দুটো মনে রাখবে। এই জায়গাটার নাম গোলপার্ক। এটুকু মনে রাখলেই যথেষ্ট। কলকাতায় আগে আসনি?

—না।

—এই প্রথম? কেমন লাগছে?

—ভালো। তবে যেমন শুনেছিলাম, মানে, আগে কলকাতা সম্পর্কে কতরকম তো গল্প শুনেছি—নিজের চোখে দেখলে সেগুলো ঠিক মেলে না।

সুকুমার বলল, তা কক্ষনো মেলে না। কল্পনায় যে জায়গা দেখা যায়, বাস্তবে তা মেলে না। তবে, কলকাতা শহরটাকে আস্তে আস্তে চিনতে হয়। বাইরে থেকে দেখার কিছুই নেই, কিন্তু এই শহরের যে একটা প্রাণ আছে, সেটা কিছুদিন না থাকলে বোঝা যায় না।

এই সময় মায়া এসে ঘরে ঢুকতেই জিয়া সম্ভ্রম দেখিয়ে উঠে দাঁড়াল। মায়া হাত জোড় করে বলল, নমস্কার। জিয়া কপালের পাশে একটা হাত তুলল।

সুকুমার আলাপ করিয়ে দিল, আমার স্ত্রী মায়া, আর এর নাম হচ্ছে জিয়াউর রহমান।

মায়া জিজ্ঞেস করল আপনি পাকিস্তান থেকে এসেছেন?

—জী। তবে এখন আমার দেশের নাম বাংলাদেশ।

—ও হ্যাঁ, হ্যাঁ। এখানে অনেকে বলে জয় বাংলা। দাঁড়িয়ে রইলেন কেন?

বসুন, বসুন।

সুকুমার তার স্ত্রীকে বলল, তুমি ওকে আপনি বলছ কেন? তুমি বলতেও পার, ও তো বয়েসে অনেক ছোট।

জিয়া বলল, ভাবী, আপনি আমাকে তুমিই বলবেন।

মায়া একটা চেয়ার টেনে বসে বলল, বেশ তো। আচ্ছা ভাই, তুমি সব রকম রান্না খেতে পার তো? আমাদের বাড়ির রান্নায় কিন্তু বেশী ঝাল থাকে না।

শুনেছি, তোমরা খুব ঝাল খাও।

জিয়া আর সুকুমার দু'জনেই হাসল। সুকুমার বলল, তোমার ধারণা বুঝি সব বাঙালরাই খুব ঝাল খায়? তোমার স্বামীও তো বাঙাল।

মায়া সুকুমারকে বলল, তুমি এতদিনে ঘটি হয়ে গেছ!

তারপর সে জিয়ার দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল, তুমি ভাই বাঙাল-ঘটির ব্যাপারটা জানো? এক সময় কলকাতায় এ নিয়ে খুব ঝগড়া হত। এখন অনেক কমে গেছে।

জিয়া বলল, গল্প শুনেছি।

—তোমার বাড়ি কোথায়? ঢাকা?

—এখন ঢাকা থেকে আসছি। আমাদের বাড়ি ফরিদপুরে।

সুকুমার উৎসাহে প্রায় লাফিয়ে উঠে বলল, ফরিদপুরে? আমাদেরও বাড়ি ছিল ফরিদপুরে। ফরিদপুরে কোথায়?

—মাদারিপুর সাব-ডিভিশান।

—আমাদেরও তো মাদারিপুর সাব-ডিভিশান।

মায়া মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, এখন তোমরা দুই বাঙালে মিলে দেশের গল্প আরম্ভ করবে নাকি? ঠিক বিহারীদের মত। দেশের গল্প পেলে আর কিছু চাও না!

সুকুমার চুপ করে গেল।

মায়া জিজ্ঞেস করল, এখন তো ওখানে গাড়ি টাড়ি চলে না। ঢাকা থেকে কি করে এলে? পায়ে হেঁটে?

জিয়া বলল, পুরোটা হেঁটে আসিনি। ঢাকা থেকে খুলনা পর্যন্ত এসেছি খানিকটা নৌকোয় আর খানিকটা ট্রাকে। খুলনা থেকে হেঁটেই এসেছি, দিনের বেলা লুকিয়ে থাকতাম, রাত্তিরে রাত্তিরে

হেঁটে এসেছি—সাতক্ষীরা হয়ে এদিকের বর্ডার, সেখানে নদী পার হয়েছি সাঁতরে।

মায়া দারুণ অবাক হয়ে বলল, তুমি সাঁতরে নদী পার হতে পারো? বাবাঃ! সেই বিদ্যাসাগর মশাই সাঁতরে দামোদর পার হয়েছিলেন শুনেছি।

সুকুমার বলল, এতে অবাক হবার কিছু নেই। হাঁসনাবাদের দিকে এই গ্রীষ্মকালে ইছামতী নদী বেশ সরু থাকে। সাঁতরে পার হওয়া খুব সহজ, আমিও পারি!

মায়া তবু বলল, কিন্তু যাই বল, যদি সেই সময় ওপার থেকে গুলি চালাতো?

—চালায় তো মাঝে মাঝে। তবে অন্ধকারের মধ্যে ঠিক নিশানা করতে পারে না।

—তোমার কাছ থেকে তাহলে অনেক গল্প শোনা যাবে। সেই খুলনা থেকে পায়ে হেঁটে আসা কি সোজা কথা? এখান থেকে খুলনা কতদূর?

জিয়া ঠিক জানে না, সুকুমারের মুখের দিকে তাকাল। সুকুমার বলল, শ'খানেক মাইল হবে।

মায়া অবিশ্বাসের সুরে বলল, মোটে? আমার ধারণা তো অনেক দূরে।

সুকুমার বলল, তোমরা ঘটিরা কিছুই খবর রাখো না ওদিককার। এখান থেকে ঢাকা শহরটা কত দূরে বলো তো? এখান থেকে আসানসোল যতটা দূর, এখান থেকে ঢাকা শহর তার চেয়ে খুব বেশী দূরে নয়।

—ওমা, তাই নাকি! মনে হয় যেন কত দূরে!

—তার কারণ মাঝখানে অনেকগুলো নদী আছে। সরাসরি ট্রেনে যাওয়া যায় না।

—জিয়া, তোমার বাড়িতে কে কে আছেন?

—মা, বাবা, আরও চার ভাই, দুই বোন।

মায়া সুকুমারের দিকে ফিরে বলল, ওরা তো সব কথা আমাদের মতনই বলে।

আমি ভেবেছিলাম অন্যরকম। তোমরা মাকে আম্মা বল না?

—তাও বলি।

সুকুমার বলল, খুব বেশী তফাৎ নেই। শুধু ওরা দাদাকে বলে বড়ভাই আর জামাইবাবুকে বলে দুলাভাই, তাই না?

জিয়া হাসল।

মায়া বলল, আর জলকে তো পানি বলে?

সুকুমার বলল, সে তো কিছু হিন্দু বাঙালী ছাড়া গোটা ভারতবর্ষের লোকই পানি বলে। তুমি এখান থেকে দেওঘর-মধুপুর গেলেই তোমাকে পানি বলতে হবে।

—তা ঠিক। আচ্ছা ভাই জিয়া, তোমাকে একটা কথা বলি, আমার শরীর এখন বিশেষ ভাল নয়—তোমাকে হয়তো বেশী যত্ন টত্ন করতে পারব না। আমরা যা ডাল ভাত খাই, তাই খাবে। ঠিক নিজের বাড়ির মতন মনে করে থাকবে, কেমন?

জিয়া একটুক্ষণ চুপ করে রইল। তারপর হঠাৎ আস্তে আস্তে বলল, ভাবী, আমার নিজেরও একজন ভাবী আছেন, তাঁকে অনেকটা আপনার মতন দেখতে। আপনাকে প্রথম দেখেই তাঁর কথা মনে পড়ছে। জানি না, তিনি এখনো বেঁচে আছেন কিনা।

মায়া উদ্বেগের সঙ্গে জিজ্ঞেস করল, কেন, বেঁচে থাকবেন না কেন, কি হয়েছে?

—সাতাশে মার্চের পর থেকে আমার বড় ভাইয়ের আর কোনো খবর পাওয়া যাচ্ছে না। গোলমাল শুরু হবার পর আমার বাবা-মায়েরা দেশের বাড়ি চলে গেলেন, কিন্তু ভাবী কিছুতেই ঢাকা ছেড়ে যেতে চাইলেন না।

—ওমা! তারপর আর কোন খবর পাওনি?

সুকুমার মাঝখানে বাধা দিয়ে বলল, থাক, থাক, ওসব কথা পরে হবে

চলো, এখন ছেলেটাকে ওর ঘরটা দেখিয়ে দিয়ে আসি আগে।

সুকুমার ওদের নিয়ে উঠে এল ছাদে। চাবি দিয়ে ঘর খুলল।

মায়া বলল, ইস, ঘরটা কয়েকদিন পরিষ্কার করা হয় নি। ধুলো জমে গেছে। দাঁড়াও, আমি আগে সাফ করে দিচ্ছি।

॥ ২ ॥

সুকুমারের খুব ভোরে চা খাওয়া অভ্যাস। ঠিক ছ'টার সময় নন্দু ঘরের দরজা ঠেলে, ট্রেতে করে চায়ের পট আর কাপ দিয়ে যায়। মায়া চা তৈরি করে, সুকুমারকে ঠেলে ঠেলে জাগায়! প্রায় চোখ না খুলেই সুকুমার চা-টা খেয়ে নেয়, তারপর আবার ঘুমিয়ে পড়ে। অত ভোরে খবরের কাগজ আসে না। খবরের কাগজের সঙ্গে তার দ্বিতীয় কাপ চা চাই।

মায়া সুকুমারের মাথার কাছে চায়ের কাপটা রেখে জিজ্ঞেস করল, ওকে চা দিতে হবে না?

—কাকে?

—ঐ ছেলেটিকে? কি যেন ওর নাম?

—জিয়া? কিন্তু ও কি এত সকাল সকাল উঠেছে?

—যদি উঠে থাকে? যদি ওরও সকাল সকাল চা খাওয়ার অভ্যেস থাকে?

—নন্দুকে দিয়ে পাঠিয়ে দাও না এক কাপ!

মায়া জোরে জোরে ডাকল, নন্দু। নন্দু!

কোনো সাড়া পেল না।

তখন মায়ার মনে পড়ল। নন্দু তো এ সময় থাকে না। ওদের চা দিয়েই নন্দু দুধ আনতে চলে যায়। ফিরবে আধ ঘন্টা বাদে।

—তুমিই চা-টা দিয়ে এসো না!

সুকুমার চোখ না খুলে বলল, আমি? আমি এখন বিছানা ছেড়ে উঠতে পারব না!

মায়া বলল, তা হলে আমিই দিয়ে আসছি!

সুকুমার এবার চোখ মেলল। মায়া গর্ভবতী, বার বার সিঁড়ি

দিয়ে ওঠা-নামা করা তার পক্ষে উচিত নয়। সুকুমারের আর আলস্য-সুখ উপভোগ করা হল না। তড়াক করে উঠে বসে বলল, না না, আমিই দিয়ে আসছি।

পাজামার দড়িটা খোলা ছিল, উঠে দাঁড়িয়ে সুকুমার তাতে গিঁট বাঁধলো। অনেক দিন সে এত ভোরে বিছানা থেকে ওঠেনি। একবার পেছন দিকে হাত দুটো ছড়িয়ে সে আড়মোড়া ভেঙে ঘুম তাড়ালো। তারপর চায়ের কাপটা নিয়ে উঠে এল ছাদের সিঁড়ি দিয়ে।

জিয়া এর মধ্যেই জেগে উঠেছে। ঘর থেকে বেরিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ছাদের কার্নিসের কাছে।

—জিয়া, তোমার চা!

জিয়া মুখ ফেরালো। তার মুখখানা অদ্ভুত রকমের বিষণ্ণ। সে যেন রাস্তার দিকে তাকিয়ে থেকেও দেখছিল অনেক দূরের কিছু।

সেই বিষণ্ণ মুখেই হাসি ফুটিয়ে সে বলল, এ কি, আপনি নিজে নিয়ে এলেন?

—তাতে কি হয়েছে? রাত্তিরে ঘুম-টুম হয়েছিল?

—জী।

সুকুমার তার পাশে এসে দাঁড়াল। নিজের খরখরে চিবুকে হাত বুলোতে বুলোতে সে গাঢ় স্বরে জিজ্ঞেস করল, কী, মন খারাপ লাগছে খুব? বাড়ির কথা মনে পড়ছে?

জিয়া চুপ করে রইল।

সুকুমার আবার বলল, শিগ্‌গির একটা কিছু হয়ে যাবেই। এরকম ভাবে তো আর চলতে পারে না।

জিয়া বলল, আমরাও তো খুব আশা করেছিলাম। কিন্তু কতকগুলো মাস চলে গেল···

—আর দু'এক মাসের মধ্যেই কিছু একটা হবে

—কাল ঢাকায় ফায়ারিং হয়েছে।

—কী করে জানলে ?

—কাল রাত্রে···পাশের বাড়িতে রেডিও চলছিল, তাতে শুনলাম, দেবদুলালবাবু খবরে বললেন···

আকাশে পাতলা মেঘ করে আছে, সেই ছায়ায় রাস্তার দৃশ্য হালকা হালকা দেখায়। পথে এখনও মানুষজন বেশী নেই। বেশ স্নিগ্ধ ফিনফিনে হাওয়া দিচ্ছে, খুব ভাল লাগে এই সময়টা। অথচ সুকুমারের চোখের সামনে ফুটে উঠছে, যুদ্ধ আর রক্তপাতের দৃশ্য। ইস্, কী বীভৎস একটা ছবি বেরিয়েছিল কালকের কাগজে। খুলনার কাছে দু'তিনটে সাইকেল রিক্সার ওপরে হাত পা ছড়িয়ে বেঁকে চুরে মরে পড়ে আছে সাইকেল রিক্সার চালক আর আরোহীরা। বোঝাই দায়, খান সেনারা পাশ দিয়ে যাবার সময় খেলাচ্ছলে মেশিনগানের গুলি চালিয়ে শেষ করে দিয়ে গেছে সকলকে।

পৃথিবী থেকে মারামারি কাটাকাটি বুঝি কোনদিনই শেষ হবে না। বরং আরও বাড়বে ? একটা বাঘ অন্য বাঘকে মারে না, একটা শকুনও অন্য শকুনকে মারে না—কিন্তু মানুষ মানুষকে মারে।

সুকুমার বলল, কাল দুপুরে রেডিওর খবরে শুনলাম, আমাদের প্রধানমন্ত্রী লুক্সেম বার্গে গিয়ে বলেছেন, এই ক'মাসে আমাদের দেশে প্রায় এক কোটি রিফিউজি এসেছে—এত লোককে আমাদের দেশ কতদিন ধরে খাওয়াবে ? এ ব্যাপারে সারা পৃথিবীর কোন দায়িত্ব নেই ?

কথাটা বলেই সুকুমার একটু লজ্জা পেল। এক কোটি রিফিউজির মধ্যে জিয়াও একজন। সে হয়তো ভাববে, সে সুকুমারের বাড়িতে একটা বোঝা হয়ে আছে। সুকুমার কিন্তু সে রকম কিছু ভেবে বলে নি। জিয়াতো মাত্র একদিন হল এসেছে। আগেকার দিনে সকলের বাড়িতেই তো এক আধজন অতিথি এসে থাকত। এখন অবশ্য সে রকম দিনকাল আর নেই। তবু বিপদের সময় মানুষ মানুষকে সাহায্য করেই।

জিয়া বলল, দাদা, আপনাকে একটা কথা বলব? আপনার তো অনেক জানাশুনো, আপনি আমাকে একটা কাজ দিতে পারেন?

—কাজ? কী কাজ?

—মানে, কোন চাকরি।

সুকুমার হাসতে হাসতে বলল, আর যাই করো, এখানে কারুর কাছে কখনো চাকরি চেও না। চাকরি চাওয়া একটা অশ্লীল কথা।

—অ্যাঁ?

—ঠিকই বলছি। এখানে চাকরির কথা শুনলেই লোকের মুখ শুকিয়ে যায়। শুধু পশ্চিম বাংলাতেই প্রায় চল্লিশ লাখ শিক্ষিত বেকার—এর মধ্যে তোমরা পাকিস্তানের, মানে বাংলাদেশের ছেলেরাও যদি চাকরির জন্য গুঁতোগুঁতি করো, তা হলে একটা হুলুস্থুল কাণ্ড হবে। এখানকার ছেলেদেরও আর সহানুভূতি থাকবে না তোমাদের ওপর।

জিয়া শুকনো মুখে বলল, তা ঠিক।

সুকুমার জিজ্ঞেস করল, তোমার কাছে সিগারেট আছে? তুমি সিগারেট খাও?

—জী না।

—চায়ের পর আমার একটা সিগারেট না হলে চলে না। নীচে সিগারেট আছে অবশ্য—

—আমি নিয়ে আসব?

সুকুমার বলতে যাচ্ছিল, হ্যাঁ, কিন্তু থেমে গেল। রাত্তিরবেলা মায়া একটা পাতলা নাইটি পরে শোয়। এখনো বোধ হয় সেটা বদলে শাড়ি পরে নি। এই অবস্থায় জিয়া নীচে গেলে মায়া নিশ্চয়ই খুব লজ্জা পেয়ে যাবে।

সে মুখে বলল, থাক, অমিই যাচ্ছি।

সিঁড়ির দরজার কাছে এসে সুকুমার আবার ফিরে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, তুমি প্রুফ দেখতে জানো?

—প্রুফ? মানে ছাপার প্রুফ?

—হ্যাঁ।

—জানি। আমি আওয়ামী ছাত্র লীগের একটা পত্রিকার সম্পাদক ছিলাম।

—ঠিক আছে। আমার সঙ্গে কয়েকটি বইয়ের দোকানের জানাশুনো আছে। ওরা অনেক সময় বাইরের লোক দিয়ে প্রুফ দেখায়। ওদের বলে দেখি, যদি সে রকম কিছু পাওয়া যায়। তোমার হাত-খরচটা অন্তত উঠে যেতে পারে।

—তাহলেও খুব ভাল হয়।

—দেখি।

সেদিন আর সুকুমার আবার বিছানায় ফিরে গেল না। বরং বাজার করতে বেরুল। অন্যদিন সাধারণত চাকরকেই বাজারে পাঠানো হয়, আজ সুকুমার নিজে পছন্দ করে এক গাদা মাছ আর তরিতরকারি কিনে আনল। সে নিজে অবশ্য তার কিছুই খেতে পেল না। তাকে ঠিক সাড়ে ন'টায় অফিসে বেরুতে হয়—ডাল ভাত আর দুটো মাছ ভাজা খেয়ে সে দৌড়ল।

সদর দরজার কাছে চিঠির বাক্স। তার মধ্যে তিনখানা চিঠি বোধ হয় কাল সন্ধ্যে থেকেই পড়ে আছে। সুকুমার চিঠি তিনখানা নিজের পকেটে ভরে অফিসে চলে গেল।

অফিসে গোড়ার দিকটাতেই সুকুমারের বেশী কাজ থাকে। সুকুমারদের অফিসটা আগে ছিল ইংরেজদের, এখন কিনে নিয়েছে এক মাড়োয়ারী। মাড়োয়ারী মানে আগেকার মতন ভুঁড়িওয়ালা ফতুয়াপরা ব্যবসায়ী নয়। চালচলনে পাকা সাহেব, ছ'সাতবার বিলেত ঘুরে এসেছে—অবশ্য এখনো বাথরুমে যাবার সময় কানে পৈতে দেয়। কলকাতা শহরে এই মাড়োয়ারীর আরও তিনটি ব্যবসা এবং সাতখানা বাড়ি আছে। নাম, অজিতপ্রসাদ আগরওয়াল।

সুকুমার অফিসে গিয়েই শুনল, মিঃ আগরওয়াল তার খোঁজ

করেছে। জলের গেলাসে এক চুমুক দিয়ে সুকুমার দরজা ঠেলে বড় সাহেবের ঘরে ঢুকল।

প্রকাণ্ড টেবিলের এক পাশে বসে থাকে আগরওয়াল। টেবিলের এ পাশে প্রায় আট দশটি চেয়ার—এ সবই বাইরের লোকের জন্য। নিজের কর্মচারীদের কক্ষনো সে বসতে বলে না।

সুকুমার ভেতরে এসে একটা চেয়ারের হাতল ধরে দাঁড়াতেই আগরওয়াল বলল, মিত্রবাবু, আপনি কি এ অফিসটা বন্ধ করে দিতে চান?

সুকুমার তটস্থ হয়ে বলল, কেন স্যার?

—আপনি কাল কী নোট লিখে গেছেন?

—কোনটার কথা বলছেন?

—এই যে আপনি লিখেছেন—গভর্নমেণ্ট আমাদের কাছে দশ হাজার তেরপল চেয়েছে—আর আপনি লিখেছেন ঐ তেরপল আমাদের স্টকে নেই? গভর্নমেণ্টের অর্ডার কেউ ফেরায়?

—মানে, স্যার, যা স্পেশিফিকেশান চেয়েছে—সেই সাইজের কিছুই তো আমাদের স্টকে নেই।

—নেই মানে? জুলাইতে আমরা যে মালটা নিলাম—

—সেটা তো অনেক ছোট।

—হোক ছোট।

—স্যার, গভর্নমেণ্ট চেয়েছে একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট, আর আমাদের আছে পঁচাত্তর স্কোয়ার ফুট, তাও অনেক পাতলা—এ দিয়ে মজবুত ক্যাম্প হয় না।

আগরওয়াল কান চুলকোতে চুলকোতে বলল, মিত্রবাবু, আপনার কি মাথা খারাপ হয়েছে? রিফিউজিরা এখানে এসেছে কি আরাম করার জন্য? এ কি তাজ্জব কথা। কোন রকমে থাকতে পারলেই হল? একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট তেরপল যদি না পাওয়া যায়, তাহলে কি তারা খোলা মাঠে থাকবে? পঁচাত্তরেই

থাকবে। খোলা মাঠ ভালো, না পঁচাত্তর স্কোয়ার ফুট ভালো? বলুন?

সুকুমার বললো, জায়গা অনেক কমে যাবে, এত বেশী লোক···

আগরওয়াল প্রায় ধমক দিয়ে বলল। একটু কমনসেন্স অ্যাপ্লাই করুন। জায়গা যদি কম হয়, গভর্নমেণ্ট আরও বেশী কিনবে। যান, ঐগুলোকেই একশো কুড়ি স্কোয়ার ফুট বলে চালান। গভর্নমেণ্ট এখন কত তাড়াতাড়ি পেমেণ্ট দিচ্ছে—এই সুযোগ কেউ ছাড়ে? কে মেপে দেখতে যাচ্ছে কোনটা কত স্কোয়ার ফুট?

সুকুমার চুপ করে গেল। বর্ডারের কাছে রিফিউজি ক্যাম্প-গুলোর জন্য তারা কয়েক মাস আগেও তেরপল সাপ্লাই করেছে। এ বছর বর্ষা হয়েছে সাঙ্ঘাতিক—অনেক জায়গায় ঝড়-বৃষ্টিতে ক্যাম্প উল্টে গিয়ে লোকগুলোর অবস্থা হয়েছিল আরও দুর্বিষহ। গভর্নমেণ্ট নতুন করে তাঁবু বানাবার জন্য তেরপলের অর্ডার দিয়েছে। এখন আবার ছোট মাপের পাতলা জিনিস চালান হবে? ঝড়-বৃষ্টির সময় তো এখনো পেরিয়ে যায় নি!

সে ক্ষীণভাবে বলল, স্যার, এ তেরপলগুলো শুধু ছোট নয়, পাতলা। যদি আবার ছিঁড়ে যায়—

—ছিঁড়ে গেলে গভর্নমেণ্ট আবার কিনবে?

—কিন্তু লোকগুলোর যে কষ্ট হবে!

আগরওয়াল অবাক হয়ে হাঁ করে তাকিয়ে রইল সুকুমারের দিকে। যেন মানুষের কষ্ট একটা অদ্ভুত কথা।

আগরওয়াল হঠাৎ টেবিলে এক চাপড় মেরে বলল, তারা কি এখানে আরাম করতে এসেছে? বলুন, সে কথা বলুন আগে। রোজ আসছে লাখে লাখ—এদের কতদিন আমরা খাওয়াবো, কেন খাওয়াবো! আপনার বাড়িও ইস্টবেঙ্গলে ছিল না?

—হ্যাঁ স্যার!

—আশ্চর্য, এরাই আপনাদের ওখান থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে,

জায়গা-জমি কেড়ে নিয়েছে, তবু আপনাদেরই যত বেশী দরদ ওদের জন্য! কেন?

সুকুমারের ঠোঁটে উত্তর এসে গিয়েছিল, 'যারা ভারত বিভাগ মেনে নিয়েছিল—'তাদের জিজ্ঞেস করুন সে কথা। সেই সব নেতারা অনেকে এখনো বেঁচে আছে। সে সব পুরোনো কথা এখন আর চিন্তা করে লাভ নেই। এখন ওদের বিপদ। বিপদের সময় সকলেরই উচিত সাহায্য করা।

কিন্তু মালিকের মুখে মুখে তর্ক করা চলে না। এর মধ্যেই সুকুমার ভয় পেয়ে গেছে। এত কথা তার বলা উচিত হয়নি।

আগরওয়াল আবার বলল, বাঙালীরা অদ্ভুত। নিজের কিসে ভাল হয়, তা এরা কিছুতেই বোঝে না। বরং নিজের ক্ষতি করার জন্যই সব সময় ব্যস্ত। বলুন, ঠিক বলেছি কি না?

সুকুমার মুখখানা তৈলাক্ত করে বলল, হ্যাঁ স্যার!

একটু বাদে সুকুমার নিজের টেবিলে ফিরে এল। মেজাজটা খিঁচড়ে গেছে। ভেতরে ভেতরে একটা অবরুদ্ধ ক্ষোভ। চাকরি করতে এসে মানসম্মানটুকুও টিকিয়ে রাখা যায় না। এ চাকরিটা ছেড়ে আর একটা চাকরি যদি পাওয়া যেত!

আগরওয়াল পুকুর চুরি করতে চলেছে। বর্ডারের কাছে দু'বার রিফিউজি ক্যাম্পগুলো দেখে এসেছে সুকুমার। বিশ্বাসই করা যায় না, কি করে হাজার হাজার মানুষ এত গাদা-গাদি করে থাকতে পারে দিনের পর দিন। গভর্নমেন্ট কম টাকা তো খরচ করছে না— কিন্তু এইসব আগরওয়ালদের জন্য তার বেশীর ভাগ টাকাই চলে যাচ্ছে অন্যদিকে। সুকুমার নিজেও তাতে একটা ভূমিকা নিচ্ছে। কিন্তু তার আর কী উপায় আছে? প্রতিবাদ করতে গেলে সে শুধু শুধু নিজের চাকরিটা হারাবে। এই পৃথিবীতে এখন একা কারুর প্রতিবাদের কোনো দাম নেই।

লাঞ্চের সময় সুকুমারের খেয়াল হল, তার পকেটে তিনখানা

চিঠি আছে, খোলাই হয়নি। খাবার খেতে খেতে সে চিঠিগুলো খুলে পড়তে লাগল।

একটা চিঠি লিখেছে তার ভাই বিজন। নতুন চাকরিতে সে বেশ ভালই আছে। অফিস থেকে কোয়ার্টার পেয়েছে খুব চমৎকার।

আর একটা চিঠি সাঁইবাবার কোনো ভক্তের। সেই চিঠি আবার কুড়ি কপি করে অন্যদের পাঠাবার নির্দেশ। না পাঠালে খুব বিপদ। সে চিঠিখানা সুকুমার তক্ষুনি বাজে কাগজের ঝুড়িতে ফেলে দিল।

তৃতীয় চিঠিখানা পড়েই সে দারুণ চমকে উঠল। এই রে,-এখন কী উপায়? এ রকম সম্ভাবনার কথা তো তার মাথাতে আসে নি।

চিঠিখানা লিখেছে মায়ার ছোটবোন সুলেখা। কানপুর থেকে।

সুলেখার বি. এ. পরীক্ষার রেজাল্ট বেরিয়ে গেছে, সে সেকেণ্ড ক্লাস অনার্স পেয়েছে। এম. এ. পড়বে কিনা এখনো ঠিক করেনি। তার আগে সে কলকাতায় আসতে চায়। আগামী সপ্তাহেই সে কলকাতায় আসছে।

সঙ্গে আসছে সুলেখার মা অর্থাৎ সুকুমারের শাশুড়ী। মায়ার বাচ্চা হবে, সেই সময় তিনি কাছাকাছি থাকতে চান। এর আগে তিনি চিঠি লিখেছিলেন মায়াকে কানপুরে পাঠিয়ে দিতে। মায়া নিজেই যেতে চায়নি। একা একা সুকুমারকে ফেলে রেখে সে যেতে চায় না। তাই মায়ার মা নিজেই আসছেন মেয়ের দেখাশুনা করতে।

সুকুমারের কপালে ঘাম এসে গেল। সুলেখা আর তার মা থাকবেন কোথায়? কলকাতায় ওঁদের আর কোনো আত্মীয়স্বজন নেই। সুকুমারের বাড়িতেই উঠতে হবে। তাছাড়া মায়াকেই যখন দেখাশুনা করবার জন্য আসছেন, তখন এ বাড়িতে ছাড়া অন্য বাড়িতে থাকবেনই বা কেন?

কিন্তু জায়গা কোথায়? সুকুমারের তিনতলার ফ্ল্যাটে দুটো মাত্র বড় ঘর, আর একটা এক চিলতে বসবার ঘর। বড় ঘরের দুটোর

মধ্যে একটাকে খাবার ঘর করা হয়েছে। ওদের কোথায় জায়গা দেওয়া হবে?

খাবার ঘরেই ওদের থাকবার ব্যবস্থা কোনো রকমে করে দিতে হবে। অসুবিধে হবে বেশ। ছাদের ঘরটা এই সময় খালি থাকলে সুকুমার নিজে চলে যেত ছাদের ঘরে---ওদের তিনতলাটা ছেড়ে দিত। কিন্তু ছাদের ঘরে জিয়া আছে।

জায়গার সমস্যার চেয়ে আর একটা বড় সমস্যা আছে। বাড়িতে জিয়া রয়েছে, এটা মায়ার মায়ের পছন্দ হবে তো? ওঁর একটু ছোঁয়াছুয়ির বাতিক আছে। ট্রেনে উঠে রান্না কোন খাবার খান না। একজন মুসলমানের সঙ্গে এক বাড়িতে থাকতে উনি যদি আপত্তি করেন? পুরনো আমলের লোকদের মধ্যে এইসব সংস্কার এখনো তো রয়ে গেছে?

সুকুমারের আপশোস হতে লাগল: কেন সে কাল হুম করে জিয়াকে নিয়ে এল নিজের বাড়িতে? তার বদলে অনুপমকে কিছু টাকা-পয়সা দিয়ে সাহায্য করলেই হত। এখন জিয়াকে তো আর চলে যেতে বলা যায় না? মাত্র একদিন হল এসেছে! কোনক্রমেই তাকে মুখ ফুটে কিছু বলা যাবে না।

অনুপম যে কোন সাহায্যই চায় নি। টাকা-পয়সাও চায় নি। নিজের বাড়িতে দশ-বারোটি অতিথি এনে সে মহানন্দে আছে। তাই দেখেই সুকুমারের বিবেকে একটু খোঁচা লেগেছিল। অনুপম নিঃস্বার্থভাবে যে কাজ করছে, তাই একটু সাহায্য করা উচিত নয়? কিন্তু তখন কে জানতো, এতো ঝামেলা!

সুকুমার কোনো উপায়ান্তর খুঁজে না পেয়ে চুপ করে বসে রইল।

॥ ৩ ॥

মায়া আস্তো একটা বড় মাছের মুড়ো খেতে দিয়েছে জিয়াকে।

জিয়া খাওয়া দাওয়ার ব্যাপারে বড় লাজুক। কিছু দিতে এলেই আগে থেকে হাত বাড়িয়ে না না করে। মায়াই তাই বাটিতে আলাদা করে সাজিয়ে দিয়েছে।

প্রথমেই মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখতে দেখে মায়া অবাক হয়ে বলেছিল, এ কি! আগে ডাল নিলে না?

জিয়াও সমান অবাক হয়ে মুখ তুলে বলল. আগে ডাল নেব?

—হ্যাঁ। কেন, ডাল বুঝি পছন্দ কর না?

—তা করি। কিন্তু ডাল তো শেষে খায়।

মায়া হেসে ফেলে বলল, ওমা, এসব কথা জীবনে শুনিনি! আগে মাছের ঝোল খেয়ে তারপর ডাল?

জিয়া বলল, আমরা একেবারে শেষে ডাল খাই!

—এ আবার কী অদ্ভুত নিয়ম!

—কিন্তু আপনাদের নিয়মটাই বা কি ভাল? আগে তো লোকে ভাল জিনিসটা খায়—যেমন, মাছ বা মাংস। আগেই ডাল-তরকারি এসব বাজে জিনিস দিয়ে পেট ভরিয়ে লাভ কী?

—কি জানি বাবা, আমরা তো এই রকমই খাই। ঠিক আছে, তোমার ইচ্ছে, যেমন ভাবে সুবিধে সেই ভাবে খাও।

জিয়া মাছের ঝোল দিয়ে ভাত মাখল। তারপর মুড়োটাকে খুব যত্নে, পরিপাটি করে, প্রত্যেকটি কাঁটা চিবিয়ে খেয়ে শেষ করল।

মায়া মুগ্ধ ভাবে তাকিয়ে রইল সেদিকে! তাদের বাড়িতে কেউ মাছের মুড়ো খায় না। সে নিজে তো পছন্দই করে না, সুকুমারও কাঁটা-কাঁটা বেশী পছন্দ করে না। সেইজন্য মুড়ো শুদ্ধু মাছ সাধারণত আনাই হয় না।

মায়া নিজের আন্দাজ মতন ভাত দিয়েছিল জিয়াকে। জিয়া আরও দু'বার ভাত চেয়ে নিল। তারপর বলল, বৌদি, অনেকদিন বাদে খুব তৃপ্তি করে খেলাম। এতগুলো পদতো দেশ ছাড়ার পরে আর খাই-ই নি?

মায়া বলল, এ আর এমন কি! রান্না ঠিক হয়েছে? নাকি আর একটু ঝাল হলে ভাল হত?

—না, না। খুব সুন্দর রান্না। আপনাকে আমার নিজের এক বৌদির কথা বলেছিলাম না, তিনিও এরকম রান্না করেন।

—তাই নাকি? ও হাঁ, তোমার দাদার কথা কালকে পুরোটা শোনা হল না। তোমার দাদা এখন কোথায় আছেন?

—জানি না।

একটু চুপ করে থেকে জিয়া আবার বলল, আমার দাদা ঢাকার ইত্তেফাক বলে একটা খবরের কাগজে কাজ করতেন। গোলমালের মধ্যে কদিন বাড়ি থেকে বেরোন নি—সাতাশে মার্চই জোর করে গেলেন কাজে। তারপরই গুলিগোলা শুরু হয়ে গেল—ইত্তেফাক কাগজের অফিসের মধ্যে ফায়ারিং হলো—

—তোমার দাদা তখন তার মধ্যে ছিলেন?

—না বোধ হয়। দাদার ডেড বডি পাওয়া যায়নি। অনেক খুঁজেও আমরা দাদার ডেড বডি কোথাও পাইনি। দাদা বাড়িতেও ফিরে আসেন নি।

—তা হলে নিশ্চয়ই কোথাও পালিয়ে আছেন।

—আমার দাদা খুব তেজস্বী লোক। উনি মুক্তিসেনায় যোগ দিতে পারেন। কিন্তু তা হলে কোন খবর দেবেন না কেন? কোন না কোন উপায়ে খবর তো দিতে পারতেন! আর এক হতে পারে, তিনি সেই সময়েই বর্ডার পেরিয়ে এপারে চলে এসেছিলেন। এদিক থেকে ওদিক তো খবর পাঠাবার কোন উপায় নেই।

—নিশ্চয়ই তোমার দাদা বেঁচে আছেন।

—আমার ভাবীরও সেই ধারণা। সেইজন্যই তো উনি ঢাকা ছেড়ে কিছুতেই নড়লেন না।

—তোমার বৌদির আবার কোন ক্ষতি হবে না তো?

—তা নাও হতে পারে। ঢাকা শহরে এখনো তো অনেক মানুষ-জন আছে। মেয়ে লোকদের এমনিতে কোন ভয় নেই—তবে এক হতে পারে, বৌদিকে ধরে নিয়ে গিয়ে দাদার কিংবা আমার খবর জানবার জন্য হয়তো টর্চার করবে!

—ইস! তোমার বৌদি গ্রামে চলে যাচ্ছেন না কেন?

—জেদ! বড্ড জেদী মেয়ে যে!

—তোমার বাড়িতে আর কে কে আছেন?

জিয়া প্রথমেই বলল, আমার মা নেই!

তারপর একটু থেমে আবার বলল, আর এক মা আছেন, আপনারা যাকে সতাতো মা বলেন।

মায়া বলল, সৎমা?

—জী। আর আমরা সাত ভাই বোন।

—তুমিই সবচেয়ে ছোট?

—না, আমার পরে আরও তিন বোন আছে।

—বাড়ির জন্য মন কেমন করে না? কতদিন হয়ে গেল।

—সাত মাস।

খাওয়া অনেকক্ষণ হয়ে গেছে। গল্প করতে করতে হাতের এঁটো শুকিয়ে গেছে হাতেই। অন্য অন্য দুপুরবেলা মায়াকে একলা একলাই খেতে হয়।

জিয়া বলল, বৌদি, এক গেলাস পানি···এক গেলাস জল দিন।

মায়া হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বলল, তুমি না হয় পানিই বলো, জল বলার দরকার নেই। এখানে জল বলা অভ্যেস করে ফেললে ঢাকাতে ফিরেও হয়তো জল বলে ফেলবে।

—ঢাকাতে কি আর ফিরতে পারব?

—বাঃ, কেন ফিরবে না। শিগগিরই একটা কিছু হেস্তনেস্ত হয়ে যাবে।

—করে আর হবে। চীন, আমেরিকা, ইংলণ্ড—সবাই তো পাকিস্তানের সাপোর্টার।

—ওসব আমি বুঝি না। যা অন্যায়, তা কক্ষনো বেশীদিন চলতে পারে না! একটা দেশের অতগুলো লোক কি চিরকাল অন্যায় মেনে নেবে!

—বৌদি, রাজনীতিতে এখনো ন্যায় অন্যায় বলে কিছু নেই। এখনো জোর যার মুলুক তার।

—কয়েকদিন আগে তোমার দাদা রেডিওতে ঢাকা সেণ্টার শুনছিলেন। হঠাৎ শোনা গেল জেনারেল নিয়াজীর বক্তৃতা। যশোর না কোথায় যেন বক্তৃতা করছিলেন। কী বললেন জানো? দম্ভ করে বললেন, যদি আমরা ইচ্ছে করি, আজই গোলাবর্ষণ করে কলকাতা শহরটা ধ্বংস করে দিতে পারি। কী সাহস!

—তা ইচ্ছে করলে পারে বোধ হয়।

—ইস! আর আমাদের বুঝি আর্মি নেই? তারা চুপ করে বসে থাকবে?

—আপনি জানেন না বৌদি, এক একটা পাকিস্তানী সোলজার মানে দৈত্য, তারা একজনই তিন চারজন ইণ্ডিয়ার সোলজারের সমান।

—তাই নাকি? কে বলেছে তোমাকে?

—আপনি তো ঐসব পাঠান খানসেনাদের দেখেন নি। আমরা দেখেছি, দেখলেই বুক কাঁপে। ইয়া লম্বা, ইয়া চওড়া।

—তুমিও তো ইণ্ডিয়ার সোলজারদের দেখ নি। তাছাড়া আজকালকার যুদ্ধ তো গায়ের জোরে হয় না, হয় বুদ্ধিতে আর কৌশলে।

—আমাদের খানসেনারা কী বলতো জানেন? ইণ্ডিয়ান আর্মি

সম্পর্কে ঠাট্টা করে বলতো, ওরা তো গান্ধীর দেশের সোলজার—ওদের বন্দুকে গুলির বদলে লজেঞ্চুস থাকে।

—আচ্ছা, সেই লজেঞ্চুস খাইয়েই ওদের কাবু করে দেব, দেখো। চল, হাত ধুয়ে নাও!

হাত টাত ধুয়ে ওপরে উঠে যাওয়ার আগে জিয়া লাজুক ভাবে জিজ্ঞেস করল, বৌদি, দু'একটা বই টই আপনার কাছ থেকে নিতে পারি?

মায়া বলল, হ্যাঁ নাওনা—বসবার ঘরের তাকে দেখ—অনেক বই আছে, যেটা তোমার ইচ্ছে।

—ওগুলো দেখেছি। আপনার কাছে কবিতার বই নেই?

—কবিতার বই? দু'একখানা আছে, বেশী নেই—তুমি বুঝি কবিতা পড়তে ভালবাস?

—জী।

—তুমি নিজেও কবিতা লেখ নাকি?

লজ্জায় মাথা ঝুঁকিয়ে জিয়া বলল, জী।

মায়া খুশীতে কৌতুকে ঝলমলে হয়ে উঠে বলল, তাই নাকি? বাঃ! আমাদের বাড়িতে একজন জলজ্যান্ত কবি এসে রয়েছে। তোমার দাদাকে এ খবরটা দিতে হবে তো। তোমার কবিতা আমাদের পড়ে শোনাবে না?

জিয়া আরও বেশী লজ্জা পেয়ে বলল, সে এমন কিছু নয়।

অফিস থেকে ফেরার পথে সুকুমার সোজা বাড়ি না ফিরে একবার গেল অনুপমের আস্তানায়। সেখানে এর মধ্যে আরও দু'তিনটি ছেলে কমে গেছে। এখন আছে মোট আট জন।

অনুপমের স্ত্রী শান্তাও একটি অফিসে চাকরি করে, সেও এইমাত্র ফিরেছে। একটি ছেলে সঙ্গে সঙ্গে তার সামনে এক কাপ গরম এগিয়ে দিয়ে বলল, খান বৌদি!

ছেলেটির নাম আতাউর। সবাই আতা আতা বলে ডাকে।

শান্তা বলল, আতা, তুমি এত সুন্দর চা বানাও, তুমি এখানে একটা চায়ের দোকান খুললে পার।

আতাউর সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল, তা খুলতে পারি। আপনি ক্যাপিটালটা ছান। দেবেন?

শান্তা বলল, একটা চায়ের দোকান খুলতে কত টাকা লাগে? ঘর ভাড়া নেবার দরকার নেই, আমাদের বাইরের ঘরটাতেই বসবে—আর তো কয়েকটা কেটলি আর কাপ ডিস কেনা।

অন্য একটি ছেলে বলল, কাপ ডিস না, ভাঁড়। ভাঁড়ের চা-ই বেশী চলে দেখেছি।

অনুপম বলল, কিন্তু কলকাতায় চায়ের দোকান চালাবার আসল বিপদ কী জান? অনেকেই এসে ধারে খাবে। ধার না দিলে খদ্দেরও আসবে না। শেষ পর্যন্ত এত ধার জমে যাবে যে হিসেবের কুল কিনারা পাবে না।

আতা সগর্বে বলে উঠল, হিসাবে আমারে কেউ ঠকাইতে পারবে না। আমি ইকনমিকসের ছাত্র।

সবাই হো হো করে হেসে উঠল।

এখানে বেশ একটা আনন্দময় পরিবেশ। সবাই মিলে সুন্দর একটা পিকনিকের আবহাওয়া তৈরি করে রেখেছে।

তবু এদের মধ্যে সুকুমার একটু সঙ্কুচিত বোধ করল। সে মনে মনে ভেবে এসেছিল, গোপনে অনুপমকে অনুরোধ করবে, যদি জিয়াকে এখানে ফিরিয়ে আনা যায়।

কিন্তু এখানে এসেই বুঝতে পারল, সে প্রস্তাব তোলা অসম্ভব। সকলেই তাকে ভাববে, স্বার্থপর। নীচ! অনুপম এতগুলি ছেলের থাকা খাওয়ার ভার নিয়েছে, আর সে একজনেরও ভার নিতে পারল না?

কিন্তু ঠিক এই সময়েই যে সুকুমারের শ্যালিকা আর শাশুড়ী এসে হাজির হবে, তা কি সে আগে জানতো ?

শান্তা জিজ্ঞেস করল, জিয়া কেমন আছে সুকুমারদা ? ওর ওপর আমার বেশ মায়া পড়ে গিয়েছিল, ও চলে যাওয়ায় কাল থেকে আমার মনটা খারাপ হয়ে আছে।

অন্য একটি ছেলে বলল, বৌদি, একদিন তো আমরা সবাই চলে যাব। তখন আপনি মন খারাপ করবেন ?

শান্তা বলল, না। তোমরা যেদিন তোমাদের স্বাধীন দেশে ফিরে যাবে—সেদিন তো আমি আনন্দ করব! অবশ্য একটু একটু মন খারাপও লাগবে!

আতা বলল, একটু একটু! বৌদি আমাগো ভালোবাসেন না, শুধু জিয়াকেই ভালোবাসেন!

—তুই চুপ কর তো আতা। বলুন সুকুমারদা, জিয়ার খবর বলুন!

সুকুমার বলল, সে তো ভালই আছে। তবে খুব লাজুক তো, মুখ ফুটে কিছু চায় না।

আতা বলল, মোটেই লাজুক না। মিটমিটা শয়তান!

—আবার আতা! চুপ করবি ?

সুকুমার বলল, আমার মনে হয়, মাঝে মাঝে ও একা থাকলে কাঁদে। এখানে বোধ হয় সকলের সঙ্গে মিলে মিশে বেশী ভাল ছিল। আমার ওখানে হয়তো ওর একা একা লাগছে।

অনুপম অন্য ছেলেদের দিকে হাত দেখিয়ে বলল, ওরা সবাই এক এক সময় মুখ লুকিয়ে কাঁদে। কাঁদবে না ? নিজের দেশের কথা ভেবে কাঁদবে না ? মা বাপ আত্মীয়স্বজন কে কোথায় আছে জানে না—

শান্তা বলল, জিয়ার পক্ষে আলাদা থাকাই ভাল। এখানে তো সব সময় হৈ চৈ। ও একটু পড়াশুনো করতে চায়। সেই সুযোগ পাবে।

অনুপম বলল, কয়েকটা কাজের কথা বলে নিই আগে। জিয়াকে বলিস মুজিবনগরের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে। আর মুক্তিবাহিনীতে নামটাও যেন লিখিয়ে রাখে—শিগগির ট্রেনিং-এর জন্য ডাক পড়বে।

সুকুমার বলল, ট্রেনিং? ঐটুকু ছেলে যুদ্ধ করবে নাকি?

আতা বলল, ঐটুক মানে? আপনি ওর বয়েস কত মনে করেন?

—আঠারো-উনিশ!

—মোটেই না। বাইশ। আর আঠারো-উনিশ হইলেই বা কি? দ্যাশের জন্য আমরা সবাই যুদ্ধ করুম। আমাগো দ্যাশের জন্য আমরা যুদ্ধ করুম না তো করবে অইন্যে?

শান্তা জিজ্ঞেস করল, অইন্যে মানে?

অনুপম বলল, তুমি বাঙাল ভাষা একদম বোঝো না! অইন্যে মানে হচ্ছে অন্যলোকে। অনেকদিন বাদে বেশ খাঁটি বাঙাল ভাষা শুনছি—কলকাতায় আগে খুব শোনা যেত। পুজোর সময় অনেকেই তখন দ্যাশে যেত। আমিও যেতাম। জানো আতা, যে দেশটা তোমাদের হবে—সেটা এক সময় আমাদেরও দেশ ছিল- কিন্তু আমরা আর সেখানে কখনো যাব না!

শহীদ নামে একটি ছেলে বলল, কেন যাবেন না? নিশ্চয়ই আপনারাও আসবেন।

—বেড়াতে যেতে পারি। থাকতে তো আর যাব না!

—কেন থাকবে না? আপনাদের বাড়ি তো আছে, বিক্রি তো করেন নি?

—তাহলেই হয়েছে আর কি! আমরা যদি অতদিন আগে ছেড়ে-আসা বাড়িতে আবার যাই, তাহলেই দাঙ্গা-হাঙ্গামা শুরু হয়ে যাবে। যুদ্ধের চেয়ে দাঙ্গা-হাঙ্গামা অনেক খারাপ। যুদ্ধের তবু কিছু নিয়ম নীতি থাকে, যুদ্ধে বীরের মতন মরা যায়, কিন্তু দাঙ্গা-হাঙ্গামা করে

কাপুরুষেরা। না, আমরা আর আমাদের বাড়ি ঘর ফেরৎ নিতে যাব না। আমরা এখন অন্য দেশের নাগরিক।

প্রসঙ্গটা বদলাবার জন্য সুকুমার বলল, আচ্ছা অনুপম, মুজিবনগরটা কোথায় রে? কাগজে প্রায়ই নাম দেখি, কিন্তু জায়গাটা ঠিক কোথায় তা তো বলে না!

অনুপম একটু চুপ করে গেল। তারপর বলল, বিদেশী সাংবাদিকরাও জায়গাটা হন্যে হয়ে খুঁজছে। কেউ টের পায়নি এখনো।

—তাহলে? কেউ যদি যোগাযোগ করতে চায়।

—মুজিবনগর বেশীদিন এক জায়গায় থাকে না। এটাকে বলতে পারিস, একটা চলন্ত রাজধানী। স্বাধীনতার লড়াইয়ের সময় দেশের বাইরেও অস্থায়ী সরকারের এই রকম চলন্ত রাজধানী থাকে—ইতিহাসে অনেকবার দেখা গেছে।

আতা বলল, একদিন আমরা এই মুজিবনগরকে মাথায় করে ঢাকায় নিয়ে যাব।

একটু বাদে সুকুমার বেরিয়ে পড়ল ওখান থেকে। বাসে না উঠে হাঁটা পথ ধরল। অনুপমদের বাড়িতে ঐ সব ছেলেদের সঙ্গে কথাবার্তা বললে বেশ একটা উত্তেজনা বোধ হয়। বাঙালীরা বহুকাল কোন যুদ্ধবিগ্রহ করে নি। এতকাল পর বাঙালীরা একটা ঐতিহাসিক যুদ্ধে মেতেছে। যুদ্ধ এখনো পুরোপুরি শুরু হয়নি ঠিকই, কিন্তু আকাশে বাতাসে যেন তার গন্ধ ভাসছে। সুকুমার নিজেও কোন না কোন ভাবে তার অংশীদার—এই কথা ভাবলেও একটু রোমাঞ্চ হয়। জিয়া যদি মুক্তিবাহিনীতে যোগ দেয় তাহলে সেও হবে একজন যোদ্ধা, সেই রকম একজন যোদ্ধাকে সুকুমার নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছে! অথচ, সুকুমার দ্বিধা করছিল, শ্যালিকা, শাশুড়ীর কথা ভেবে সে দ্বিধা করছিল। দূর ছাই, যাই হোক না কেন. জিয়াকে সে কিছুতেই চলে যেতে বলতে পারবে না!

বালীগঞ্জের লেকের পাশ দিয়ে আসতে আসতে ভেতরের রিফিউজি কলোনীটার দিকে তার চোখ পড়ল। তার ভুরু দুটো একটু কুঁচকে গেল। এই রিফিউজিগুলোকে এখনো অন্য কোথাও সরানো গেল না। লেকের এই দিকটা কেমন নোংরা হয়ে আছে।

তারপরই একটু হাসি পেল সুকুমারের। স্বাধীনতার পর এতগুলো বছর কেটে গেল, তবু এই লোকগুলিকে এখনো রিফিউজি বলা হয়। আজ পর্যন্ত এদের একটা সম্মানজনক নামও জুটল না। সে নিজেও তো এরকম রিফিউজি হতে পারত—নেহাৎ তার বাবা সেই সময় একটা চাকরি পেয়েছিলেন, তাই রক্ষে।

এখন যারা আসছে, তারাও রিফিউজি। এক আধজন নয়, এক কোটি?

॥ ৪ ॥

সুলেখা আর তার মাকে হাওড়া স্টেশন থেকে আনতে গিয়েছিল সুকুমার। ফেরার সময় ট্যাক্সিতে উঠেও সে বলতে পারল না যে তাদের বাড়িতে এখন অন্য একটি ছেলে থাকে। সুলেখার মা বিনতা দেবীর বেশ রাশভারি চেহারা, লালপেড়ে একটা গরদের শাড়ি পরে আছেন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে মায়ার স্বাস্থ্যের খবর নিলেন। সুকুমার সংক্ষেপে উত্তর দিয়ে যাচ্ছে।

সুলেখা হঠাৎ বলল, সুকুমারদা, আপনাকে এত গম্ভীর মনে হচ্ছে কেন?

সুকুমার চমকে উঠে বলল, কই না তো?

সুলেখা বলল, হ্যাঁ, দেখছি যেন কী রকম একটু অন্যমনস্ক। কাল কি রাত্তিরে ঘুম টুম হয়নি নাকি? দিদির শরীর কী রকম আছে ঠিক করে বলুন তো!

—মায়া? মায়া খুব ভাল আছে—এই তো আসবার সময় দেখে এলাম তোমাদের জন্য রান্না করছে!

সুলেখার মা বললেন, সে আবার এই শরীর নিয়ে রান্নাঘরে গেল কেন?

বাড়িতে এসে কিন্তু সুলেখা আর তাঁর মা মায়াকে দেখে নিশ্চিন্ত হলেন। মায়ার চোখ-মুখে সামান্য একটু ফোলা-ফোলা ভাব আছে, কিন্তু ক্লান্তির কোনো চিহ্ন নেই। সদ্য রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে, আগুনের আঁচে তার মুখে একটা লালচে আভা পড়েছে।

মা মেয়ের সাধ দেবেন। তাই কানপুর থেকে শাড়ি আর কিছু জিনিসপত্তর নিয়ে এসেছেন। সুলেখা তক্ষুনি বাক্স খুলে সেগুলো দেখাতে বসে গেল।

এখন বেশ কিছুক্ষণ মেয়েলি গল্প চলবে—সুকুমারের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। সুকুমার বলল, আমি একটু ঘুরে আসি—

মায়া বলল, বেশী দেরি করো না, কিন্তু!

সুকুমার সিঁড়ি দিয়ে নেমে প্রায় একতলায় পৌঁছেচে, এমন সময় শুনতে পেল ওপরের সিঁড়ি দিয়ে চটি পরে ফট ফট করে নেমে আসছে জিয়া। ডাকছে, বৌদি, বৌদি!

এই ক'দিনে জিয়া অনেক সহজ হয়ে গেছে। মায়ার সঙ্গে ভাব হয়ে গেছে বেশ। তার কিছু দরকার হলে যখন তখন নীচে চলে আসে।

সুকুমার ভাবলো, জিয়ার সঙ্গে প্রথম পরিচয়টা মায়াই সামলে দিক। সে থাকে নি, ভালই হয়েছে। সে তাড়াতাড়ি বাড়ি থেকে বেরিয়ে গেল।

বৌদি বৌদি বলে ডাকতে ডাকতে জিয়া ঢুকে এল ফ্ল্যাটের ভেতরে। সামনের ঘরেই দু'জন অচেনা মহিলাকে দেখে সে থমকে গেল।

মায়া খুব সহজ ভাবে বলল, এসো জিয়া! তোমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই, আমার মা আর আমার ছোট বোন সুলেখা।

বিনতা দেবী তাড়াতাড়ি মাথার কাপড় টেনে দিলেন। চোখে বিস্মিত দৃষ্টি।

মায়া বলল, মা, এ হচ্ছে, জিয়া। ওপরে বিজনের ঘরে থাকে। জিয়া হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তান—মানে জয় বাংলার লোক, মুক্তিবাহিনীতে ট্রেনিং নিচ্ছে।

জিয়া দরজার কাছে দাঁড়িয়ে কপালের কাছে এক হাত তুলে বিনীত ভাবে আদাব জানাল।

সুলেখার চোখে বিস্ময়। সত্যি সত্যি মুক্তিবাহিনীর লোক! প্রত্যেক দিন খবরের কাগজে যাদের কথা পড়ছে! দেখে তো মনে হয় একটা বাচ্চা ছেলে, এই ছেলে বন্দুক চালায়?

মায়া বলল, এসো জিয়া, ভেতরে এসে বসো।

জিয়া বলল, না, বৌদি। আমি একটা কাজ করছিলাম। আপনার কাছে লেই আছে?

—লেই? লেই মানে?

—আপনারা লেই বলেন না? কোনো রকম আঠা?

—ও, গঁদ? হ্যাঁ আছে, দিচ্ছি।

মায়া সুকুমারের টেবিল থেকে গঁদের শিশিটা দিতেই জিয়া সেটা নিয়ে আবার অভিবাদন জানিয়ে চলে গেল।

বিনতা দেবার মুখটা অপ্রসন্ন। একটুক্ষণ ঘরের আর সবাই চুপ-চাপ। তারপর তিনি বললেন, ছেলেটি এখানে কতদিন ধরে আছে?

মায়া বলল, এই তো, বারো-তের দিন হোল।

—কোথায় খায়? এখানেই।

—হ্যাঁ। আর কোথায় খাবে?

—তোকেই রান্না-বান্না সব করতে হয় তো?

—হ্যাঁ, মা। অসুবিধে কিছু হয় না। অবশ্য আমরা রান্নার লোক একটা খুঁজছি, ঠিক পাওয়া যাচ্ছে না।

—সুকুমারের এ কি রকম আক্কেল? তোর এখন শরীরের এই অবস্থা, এই সময় বাড়িতে কেউ অতিথি আনে? ঐ ছেলেটি রিফিউজি ক্যাম্পে থাকেনি কেন?

মায়া তার মাকে একটু একটু ভয় করে। মায়ের মেজাজ গরম হয়ে গেলে সহজে থামানো যাবে না।

সে মৃদু গলায় বলল, কলকাতায় এ রকম অনেকের বাড়িতেই এখন একজন দু'জন করে অতিথি রাখা হয়েছে।

সুলেখা বলল, মা, রিফিউজি ক্যাম্পে তো শিশু, বুড়ো আর মেয়েরা আছে। যারা যুদ্ধ করবে, তারা ক্যাম্পে থাকলে কি চলে?

—লোকের বাড়িতে থেকে আবার কী রকম যুদ্ধ বাপু? সে তো আমি বুঝি না।

কথা ঘোরাবার জন্য মায়া বলল, ইস্, এই শাড়ির পাড়টা কী চমৎকার। এর তো অনেক দাম, মা।

সুলেখা বলল, না, দিদি, এটা বেশ সস্তায় পাওয়া গেছে!

সুকুমার ফিরলো একটু বেশী রাত করে। মনে মনে আশংকা ছিল শাশুড়ী, নিশ্চয়ই ইতিমধ্যে একটা ঝড় তুলে ফেলেছেন। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় মনে হল, সব শান্ত। বড় বেশী শান্ত? তার মানে তো ঝড় এখনো শুরু হয়নি।

দরজা খুলে দিল সুলেখা।

সুকুমারকে দেখেই ফিস-ফিস করে বলল, দিদির ব্যথা উঠেছে।

সঙ্গে সঙ্গে সুকুমার ব্যস্ত হয়ে উঠল। অ্যাঁ? তা হলে তো নার্সিং হোমে···পাড়ার একটা ট্যাক্সিকে বলে রাখা আছে···কতক্ষণ থেকে ব্যথা?

সুকুমার ছুটে চলে এলো শোবার ঘরে। মায়া চোখ বুজে শুয়ে আছে, মাথার কাছে তার মা।

সুকুমার বলল, খুব ব্যথা! ট্যাক্সি ডাকতে পাঠাবো?

মায়া চোখ মেলে বলল, না। কমে গেছে।

সুকুমার বলল, তা হলেও···এখন থেকেই ভর্তি হয়ে থাকলে ভাল···পরে বেশী বেশী ব্যথা উঠলে যদি যেতে অসুবিধে হয়!

মায়া বলল, না, তার দরকার নেই···আমি বুঝতে পেরেছি, এটা সে রকম ব্যথা নয়।

—তবু একবার ডাক্তারবাবুকে ডাকবো?

—ডাকা হয়েছিল, উনি দেখে গেছেন।

বিনতা দেবী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি ফিরতে এত দেরি করলে কেন?

সুকুমার লজ্জিতভাবে বলল, এক বন্ধুর বাড়িতে আটকে গিয়েছিলাম—

—এখন কয়েকটা দিন একটু তাড়াতাড়ি ফিরো—কখন কি হয়।

—হ্যা·· মানে···হিসেব অনুযায়ী আরও তো দশ বারোদিন দেরী হবার কথা।

—মানুষের জন্ম কি আর অত হিসেব মিলিয়ে হয় ?

মায়া বলল, তুমি খেয়ে নাও! সুলেখা তোমার খাবার দিয়ে দেবে।

হাত-মুখ ধুয়ে সুকুমার এসে খাবার টেবিলে বসল। শুধু তার একার খাবার দিয়েছে সুলেখা।

একটু ইতস্তত করে সুকুমার জিজ্ঞেস করল, তোমরা সবাই খেয়ে নিয়েছে।

সুলেখা বলল, হ্যাঁ, আমি আর মা তো এই একটু আগে খেয়ে নিলাম—আপনার জন্য অপেক্ষা করে করে···মা'র তো গ্যাসট্রিক আছে, বেশী রাত্তিরে খেলে হজমই হয় না—দিদি তো আজ কিছুই খেল না, শুধু এক কাপ গরম দুধ।

সুকুমার ভাত ভেঙে ঝোল দিয়ে মাখতে লাগল। তার মনের মধ্যে একটা অশ্বস্তি: জিয়া কি খেয়েছে? ব্যথার সময় মায়া হয়তো জিয়ার কথা ভুলে গেছে ··এরা দু'জন কি মনে করে তাকে খেতে ডেকেছিল ?

একটু বাদেই সে জিজ্ঞেস করল, ওপরে যে ছেলেটি থাকে, সে খেয়েছে ?

সুলেখা বলল, হ্যাঁ। তার খাবার তো নন্দুকে দিয়ে ওপরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে।

সুকুমার আবার একটা আঘাত পেল। ওপরে খাবার পাঠানো হয়েছে? জিয়া নিশ্চয়ই অবাক হয়ে যাবে। দুঃখ পাবে। এ পর্যন্ত প্রত্যেকদিন তো সে ওদের সঙ্গে খাবারের টেবিলে বসেই খেয়েছে। বাড়ির ছেলের মতন। আজ সে ভাববে যে, তাকে দূরে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। এমন কি সে যদি ভাবে যে হিন্দুদের ছোঁয়াছুঁয়ির রোগ···

সুকুমার প্রথমে সকলের ওপর বিরক্ত বোধ করল, তারপর

আবার নিজেই নিজেকে যুক্তি দিয়ে বোঝাল, আজ মায়া অসুস্থ, সুকুমার বাড়িতে ছিল না—সুলেখা আর তার মা নতুন এসেছে—তারা যদি একটি অচেনা ছেলেকে নিজের খাবার টেবিলে না ডাকে, সেটা নিশ্চয়ই খুব দোষের নয়। জিয়া নিশ্চয়ই এটুকু বুঝবে।

—সুকুমারদা, আপনি আর একটু ভাত নেবেন না ?

—না, হয়ে গেছে খাওয়া। ঐ ছেলেটির সঙ্গে তোমার আলাপ হয়েছে, সুলেখা ?

—এই একটুখানি। বেশী কথা হয় নি।

—কথা বলে দেখো, বেশ ভাল ছেলে।

—সুকুমারদা আমাকে একদিন বর্ডারে নিয়ে যাবেন ?

—কেন ? সেখানে গিয়ে কী করবে ?

—একটু যুদ্ধ দেখব।

—বর্ডারে গেলেই বুঝি যুদ্ধ দেখা যায় ?

—বাঃ, প্রায়ই তো গোলাগুলি এসে পড়ে, কাগজে দেখেছি।

—তা এসে পড়ে—কিন্তু সেখানটায় তো যেতে দেবে না—কয়েকজন গ্রামের লোক এই রকম ভাবে মারাও গেছে।

—তা হোক, তবু আমি যাব !

—আচ্ছা দেখি, যদি সুবিধে হয়।

মেয়েরা তিনজন বড় ঘরটাতে এক সঙ্গে শোবে। খাবার ঘরেই সুকুমারের জন্য বিছানা পাতা হয়েছে। খেয়ে উঠে সুকুমার বিছানায় বসল, সুলেখা বসল চেয়ারে। সে একটু গল্প করতে চায়।

সুলেখা বলল, আপনার এ-ঘরে শুতে নিশ্চয়ই কষ্ট হবে !

সুকুমার বলল, তা একটু হলেই বা কি ! কলকাতা শহরে আরও কত লোক এর চেয়েও বেশী কম জায়গা নিয়ে থাকে।

একটু থেমে, সুকুমার দুষ্টুমীর হাসি হেসে বলল, আমার অবশ্য কোন কষ্টই হত না, যদি তুমিও আমার সঙ্গে এই বিছানায় ঘুমোতে। আসবে নাকি ?

—এই অসভ্য !

—সত্যিই, তোমার মা যদি না আসতেন, তাহলে আমি সেই ব্যবস্থাই···শ্যালীকা মানে তো অর্ধেক স্ত্রী।

—ইস, খুব শখ।

—তা সুলেখা, এবার তোমার জন্য একটা ফুটফুটে বর জোগাড় করতে হয়—তোমার মা বলছিলেন।

—মোটেই কিছু বলে নি আপনাকে। আমি এম. এ. পড়ব।

—তোমার মায়ের ভয়, এম. এ. পড়তে গিয়ে যদি আবার প্রেমে পড়ে যাও—পাশের ঘর থেকে বিনতা দেবী সুলেখাকে ডাকলেন। সুকুমার আর সুলেখা দু'জনেই উঠে গেল। মায়াকে এখন ওষুধ খাওয়াবার কথা। মায়া এরই মধ্যে গভীর ভাবে ঘুমিয়ে পড়েছে। তার মুখখানা শান্ত। ব্যথার চিহ্নমাত্র নেই।

॥ ৫ ॥

সকালবেলা সুকুমার অফিসে যাবার আগেই জিয়া জামাকাপড় পরে বেরুবার জন্য তৈরি হয়ে নীচে নেমে এল। ফ্ল্যাটের দরজার কাছ থেকে ডেকে বলল, সুকুমারদা একটু শুনবেন।

সুকুমার খবরের কাগজ পড়ছিল, সেটা হাতে নিয়েই উঠে এল।

জিয়া জিজ্ঞেস করল, বৌদি কেমন আছেন?

—ভাল, বেশ ভাল আছেন।

—আমাকে আজ একটু বসিরহাট যেতে হবে। একটা নতুন ট্রেনিং প্রোগ্রাম আছে।

—বসিরহাট? তুমি ঠিক বাস টাস চিনে যেতে পারবে? শ্যামবাজার থেকে বাসে উঠতে হবে।

—শ্যামবাজারে আভা, শহীদ, জয়নুলরা অপেক্ষা করবে আমার জন্য। সুকুমারদা, আমাকে তুটো টাকা দিতে হবে।

—নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!

সুকুমার পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে একটা পাঁচ টাকার নোট বার করল।

—এটা নিয়ে যাও।

—উঁহুঃ, আমার তু'টাকা দরকার। গাড়ি ভাড়া।

—আরে, এটা নিয়ে যাও না!

—না, আমি বেশী নিয়ে কি করব?

—রেখে দাও না, যদি লাগে। তা ছাড়া তুপুরে খাবে কোথায়?

—ক্যাম্পে খাবার ব্যবস্থা থাকবে। আমাকে তু'টাকাই দিন।

—খুচরো নেই। রাখো না এটা!

সুকুমার জোর করে পাঁচ টাকার নোটটা জিয়ার পকেটে ভরে দিল। জিয়া সেটা নিয়ে চটপট করে নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

একটু বাদেই ফিরে এল আবার। মোড়ের পাশের দোকানটা থেকে টাকাটা ভাঙিয়ে এনেছে। সুকুমারকে তিন টাকা ফেরত দিয়ে বলল, আমার এর বেশী লাগবে না।

—আচ্ছা পাগল ছেলে তো! টাকা সঙ্গে রাখলে কী ক্ষতি হত।

—লাগলে তো নিতামই। আপনার কাছ থেকে তো অনেক কিছুই নিচ্ছি।

সুকুমার জিয়ার চলে যাওয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। জিয়ার গলার আওয়াজে কি খানিকটা ক্ষোভ ফুটে উঠেছে? সত্যিই তার ট্রেনিং আছে, না ইচ্ছে করে চলে গেল। কাল রাত্তিরের ব্যাপারে কি অপমানিত বোধ করেছে? এই সব কথা তো মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করাও যায় না। ছেলেটা আজ ফিরবে কিনা সে কথাও তো বলে গেল না!

সুকুমার পেছন ফিরেই দেখতে পেল বিনতা দেবীকে। তিনি টাকা দেওয়ার ব্যাপারটা দেখেছেন।

তিনি জিজ্ঞেস করলেন, ছেলেটি এখানে কতদিন থাকবে?

সুকুমার খবরের কাগজের দিকে চোখ রেখে গম্ভীর ভাবে বলল, ঠিক নেই!

—ওকে বুঝি মাঝে মাঝেই এরকম টাকা দিতে হয়?

—না। এই কখনো কখনো এক টাকা দু'টাকা—

—আমার মামাদের মস্ত জমিদারি ছিল মৈমনসিং-এ। সব তো ওরাই নিয়েছে।

—কে নিয়েছে? এই ছেলেটি? কিংবা এরই আত্মীয়স্বজন!

তা কি আমি জেনে বসে আছি! তবে ঐ ওরাই তো।

সুকুমার এবার কাগজ থেকে মুখ তুলে ধীরে সুস্থে বলল, মা, ইতিহাস বারবার বদলায়! পুরোনো কথা আঁকড়ে ধরে বসে থাকলে কি চলে, এদিকে ওদিকে অনেক রকম অবিচারই হয়েছে এক সময়—

মায়া ঘর থেকে বেরিয়ে এসে বলল, জিয়া বেরিয়ে গেল? দুপুরে খাবে না?

সুকুমার বললে, ট্রেনিং-এ গেল—ক্যাম্পে খেয়ে নেবে।

—আমার সঙ্গে দেখা করে গেল না?

—ও বোধ হয় ভেবেছে, তুমি শুয়ে আছ।

—রোজই তো দেখা করে যায়।

বিনতা দেবী বললেন, ও কি শোবার ঘরেও ঢোকে নাকি?

—হ্যাঁ। ও তো বাড়ির ছেলের মতন।

—দেখিস বাপু! তোদের বড্ড বাড়াবাড়ি! জানা নেই, শোনা নেই স্বলেখা একটা ছোট ধমক দিয়ে বলল, মা, তুমি চুপ করো তো! তুমি বড্ড পুরোনো পন্থী! আচ্ছা স্বকুমারদা, ওরা কি রাইফেল নিয়ে ট্রেনিং নেয়?

—হ্যাঁ। জিয়া তো থ্রি নট থ্রি রাইফেল চালাতে শিখে গেছে! এখন মর্টার চালানো শিখছে।

—ইস, আমাকে একটু দেখতে দেবে না? এসব শুধু সিনেমায় দেখেছি, নিজের চোখে দেখি একবার।

—ওখানে মেয়েদের যাওয়া নিষেধ।

—কেন, মেয়েরা বুঝি যুদ্ধ করতে পারে না?

—নিশ্চয়ই পারে। গৃহযুদ্ধে তো মেয়েরা দারুণ ওস্তাদ। তোমার দিদি পর্যন্ত এমন গৃহযুদ্ধ করে!

মায়া বলল, আহা!

স্বলেখা হেসে উঠল।

সেদিন অফিসে স্বকুমারদের মাইনের দিন। ঠিক হয়েছে, সেই মাসে সকলেই একদিনের মাইনে রিফিউজি ফাণ্ডে চাঁদা দেবে। সুকুমার নিজেই উদ্যোগী হয়ে সবাইকে বুঝিয়ে এই ব্যবস্থা করেছে।

অফিসের মালিক তাঁবুর ব্যাপারে গভর্নমেন্টকে ঠকিয়ে প্রচুর লাভ করছে। সুকুমার চায় সেই পাপ যেন তাদের স্পর্শ না করে।

তাই তারা কিছুটা আত্মত্যাগ করে গ্লানিমুক্ত হতে চায়। অফিসের মালিকের একলাখ দু'লাখ টাকাতে কিছুই যায় আসে না। কিন্তু মধ্যবিত্ত পরিবারে কুড়ি, পঁচিশ টাকা কম পড়লেই গায়ে লাগে। তবু সুকুমার আশ্চর্য হয়ে লক্ষ্য করল, অফিসের একজন কর্মীও এই টাকাটা চাঁদা দিতে একটুও আপত্তি করল না।

চাঁদা উঠল প্রায় সাত হাজার টাকা। প্রথমে ঠিক হয়েছিল, টাকাটা গভর্নরস রিফিউজি ফাণ্ডে দিয়ে দেওয়া হবে। কিন্তু সেটা বড় নৈর্ব্যক্তিক ব্যাপার। ইউনিয়নের অজয়বাবু বললেন, তার চেয়ে ঐ টাকায় কোন জিনিসপত্র কিনে সরাসরি রিফিউজিদের কাছে পৌঁছে দিলেই তো হয়। সকলেই তাতে সম্মত হোল। ও টাকায় কাপড় কিনে বিলি করা হবে। অফিসের কয়েকজন লোক নিজের হাতে দিয়ে আসবে।

সুকুমার মনে মনে ঠিক করল, যেদিন বর্ডারে ঐ কাপড় নিয়ে যাওয়া হবে, সেদিন সুলেখাকেও সঙ্গে নিয়ে যাবে। ওর যখন এত সখ বর্ডার দেখার।

অফিস থেকে সুকুমার দু'হাজার টাকা ঋণ চেয়ে দরখাস্ত করেছে। মায়াকে নার্সিং হোমে রাখার একটা বড় খরচা আছে। তা ছাড়া বাড়িতে লোকজন বেড়ে যাওয়ার খরচ বেশ বাড়বেই। সুকুমারের একটা পয়সা জমা নেই কোথাও।

সুকুমারের হঠাৎ মনে হল, আজ যদি হঠাৎ সে গাড়ি চাপা পড়ে মারা যায়, তাহলে মায়াদের কী হবে? কী আবার হবে, পথে বসবে। উপায় কী! যা দিনকাল, সৎপথে থেকে কারুর পয়সা জমাবার উপায় নেই। যারা অসৎপথে যায় না, তারা অনেকেই আসলে সে পথে বাবার সুযোগ পায় না, কিংবা সুলুক সন্ধান জানে না!

সুকুমারের বাড়িতে টেলিফোন নেই। পাশের বাড়িতে বলা আছে যে দুপুরের দিকে যদি মায়ার হঠাৎ ব্যথা ওঠে, তবে-যেন সুকুমারকে সঙ্গে সঙ্গে অফিসে খবর দেওয়া হয়।

সুকুমার নিজের টেবিলের টেলিফোনটার দিকে মাঝে মাঝে এক দৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। কখনো বেজে উঠলেই চমকে ওঠে। কিন্তু বাড়ির টেলিফোন আসে না। এক এক সময় তার ভারি অদ্ভুত লাগে যে আর কয়েকদিনের মধ্যেই সে বাবা হয়ে যাবে! পরক্ষণেই তার মনে হয়, মায়াকে কত কষ্ট সহ্য করতে হবে এই কটা দিন। বাবা হওয়া নিশ্চয়ই আনন্দের, কিন্তু সবটুকু কষ্ট সহ্য করতে হয় মাকে। মায়ার যদি কিছু একটা হয়ে যায়? অনেকে তো সন্তান জন্মের সময়—না, না, তা হতেই পারে না! মায়ার কথা মনে হলেই সুকুমারের মনটা শুধু ভালোবাসা নয়, এক ধরনের স্নেহেও ভরে যায়। এত ভালো মেয়ে!

সুকুমার আবার ভাবল, তাদের সন্তানের জন্মের কথা ভেবে সে এবং মায়া যতখানি ব্যাকুল, ঠিক তেমনি বাংলাদেশের ঠিকঠাক জন্ম হবে কিনা সে জন্য ওখানকার সকলের নিশ্চয়ই ব্যাকুলতা, উত্তেজনা আরও অনেক বেশী!

সন্ধ্যের পর সুকুমার বসবার ঘরে সুলেখার সঙ্গে বসে আড্ডা দিচ্ছিল। মায়া আজ বেশ ভাল আছে। তিন কাপ চা খাওয়া হয়ে গেছে, সুকুমার আরও এক কাপ চা খাবে কিনা ভাবছে—এমন সময় জিয়া ফিরল। তার চোখ মুখ উত্তেজনায় লাল।

সে সোজা বসবার ঘরে ঢুকে এসে বলল, সুকুমারদা, আজ দারুণ খবর আছে!

সুকুমার বলল, কী হয়েছে? অত হাঁপাচ্ছো কেন? বসো! বসে বসে বল!

জিয়া ধপাস করে বসে পড়ে বলল, আমার বড় ভাই, যার কথা আপনাদের বলেছিলাম—তার খবর পাওয়া গেছে!

—তাই নাকি? কোথায়?

—আজই বর্ডারের ওপাশ থেকে একজন এসেছে, সে নিজের চোখে দেখেছে। কথাও বলেছে।

—বাঃ! দারুণ খবর।

সুলেখা জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছিল আপনার দাদার?

জিয়া সুলেখার দিকে এক পলক তাকিয়েই আবার চোখ নামিয়ে নিয়ে বলল, উনি ২৭শে মার্চ খানসেনাদের হাতে ধরা পড়েছিলেন। তারপর ওনাকে যশোর ক্যান্টনমেণ্টে আটকে রাখা হয়েছিল, সেখান থেকে গত মাসে পালিয়ে এসেছেন আরও কয়েকজনের সঙ্গে। এখন উনি বাগেরহাটে মুক্তিবাহিনীর কমাণ্ডার··· বাগেরহাট কোথায় জানেন?

সুকুমার বলল, হ্যাঁ, খুলনায় না?

—আমি যাবো! সুকুমারদা, আমিও যাবো!

—কোথায়?

—বাগেরহাটে! আমার বড় ভাইয়ের পাশে গিয়ে লড়াই করবো!

—তুমি যেতে পারবে? এখন বর্ডার পার হতে পারবে?

আমি ঠিক চলে যাবো। আমাকে কেউ আটকাতে পারবে না। আজই শুনলাম, আমাদের দুটি ছেলে ঢাকা পর্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে এসেছে, কেউ তাদের ধরতে পারে নি। তারা ঢাকার মুক্তিবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ করে এসেছে। আমাকে ওরা বলেছিল চিটাগাঙের দিকে পাঠাবে—আমি না করে এসেছি। আমি খুলনায় যাবো!

—বেশ তো, তোমার দাদা'র কাছাকাছি যাওয়াই ভাল মনে হয়। কবে যাবে?

—আর দু'চারদিন সবুর করতে হবে। বর্ডারে এখন ওরা হেভি প্যাটরোলিং শুরু করেছে। আজ তো তিন-চারবার ফায়ারিং এক্সচেঞ্জ হয়েছে!

সুলেখা উত্তেজিত ভাবে জিজ্ঞেস করল, তাই নাকি? আপনি দেখতে পেলেন?

—আওয়াজ শুনেছি! একটা মর্টারের শেল এসে নদীতে পড়ল

—কী বিরাট ভাবে জলটা লাফিয়ে উঠল তখন—আমরা সাঁতরে গিয়ে পরে শেলটা উদ্ধার করেছি—চাইনিজ মার্কা দেওয়া—

সুকুমার বলল, এবারে যুদ্ধটা লাগবেই মনে হচ্ছে। ওদিককার আর কিছু খবর পেলে?

—কিছু খারাপ খবরও আছে। সাতক্ষীরা টাউনের অনেকগুলো বাড়ি আর কয়েকটা পাড়ায় খানসেনারা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছে!

সুলেখা বলল, ইস্, শুধু শুধু নিজের দেশের লোককে ওরা এরকম ভাবে মারে?

জিয়া বলল, ওরা এখন কাউরে, মানে, কারুকে বিশ্বাস করে না!

—গোটা পূর্ব বাংলার লোককে অবিশ্বাস করলে ওরা রাজত্ব করবে কাদের নিয়ে?

সুকুমার বলল, সব লোকই কি আর ওদের বিপক্ষে। কিছু লোক নিশ্চয়ই এখনো পাকিস্তানের সাপোর্টার।

জিয়া বলল, এখন আর কেউ নেই! বাংলাভাষার প্রশ্নে সবাই এখন এক হয়ে গেছে!

সুকুমার বলল, তা যদি হয়, তাহলে তো ভালই। কিন্তু ভাষার চেয়েও ধর্ম আর অর্থনীতির প্রশ্ন নিশ্চয়ই অনেক বড়। অনেক লোক এখন ঘাপটি মেরে আছে, পরে মাথা তুলবে।

জিয়া জোর দিয়ে বলল, না সুকুমারদা, আপনি জানেন না! আমাদের দেশের সাড়ে সাতকোটি মানুষের মধ্যে প্রত্যেকেই এখন ভাষার জন্য প্রাণ দিতে পারে!

সুকুমার চুপ করে গেল। সে জানে, এটা এক ধরনের ভাবালুতা। একটা প্রবল উচ্ছ্বাস। অবশ্য এই উচ্ছ্বাসকে ঠিক মতন চালিত করতে পারলেও অনেক সময় অনেক বড় কাজ হয়।

জিয়া বলল, চট্টগ্রামের অপারেশনটাও কিন্তু দারুণ ছিল। যদি যেতে পারতাম - কিন্তু আমার বড় ভাইয়ের খোঁজ পাওয়ায় পর…

সুলেখা বলল, কী হবে চট্টগ্রামে!

—ওখানে সমুদ্র দিয়ে সাঁতরে এসে—

সুকুমার বাধা দিয়ে বলল, থাক, ওকথা বলতে হবে না।

জিয়া আর সুলেখা দু'জনেই অবাক হয়ে গেল। সুলেখা বলল, কেন, বললে কী হয়েছে?

সুকুমার বলল, যুদ্ধের সময় যে কোন অপারেশনই একটা গোপন ব্যাপার। ওসব নিয়ে বেশী আলোচনা করতে নেই।

সুলেখা একটু আহত হয়ে বলল, বাঃ, আমি কারুকে বলে দেব নাকি?

—তুমি হয়তো বলবে না।

—হয়তো মানে?

—বলছি যে তুমি নিশ্চয়ই বাইরের কারুকে বলবে না—কিন্তু নীতিগত ভাবেই এগুলো গোপন রাখা উচিত। তাছাড়া ধরো, তুমি স্পাইদের হাতে ধরা পড়লে কোনক্রমে—তারা অত্যাচার করে তোমার কাছ থেকে খবরটা বার করে নিতে পারে। কিন্তু তুমি যদি খবরটা না জানো, তা হলে আর কী বার করবে?

—আমি কী করে স্পাইদের হাতে ধরা পড়বো? আমাদের দেশের মধ্যে?

—বাঃ, আমাদের দেশের মধ্যেই বিদেশী স্পাই নেই? সেদিন কী একটা ঘটনা শুনলাম জান?

এরপর গল্পে গল্পে রাত বেড়ে গেল। যেই দশটা বাজল, অমনি সুলেখা দৌড়ে গিয়ে রেডিওটা নিয়ে এল। দেবদুলালের খবর শুনতে হবে। এই সময় সারা দেশের অসংখ্য মানুষ রেডিওর সামনে উদগ্রীব হয়ে বসে থাকে।

॥ ৬ ॥

-কী করছেন ?

জিয়া চমকে উঠল। এগারোটা বাজে। সুকুমার অফিসে চলে গেছে। মায়া শুয়ে আছে। বিনতা দেবী স্নান করে পূজোয় বসেছেন। সুলেখার কিছুই করার নেই। বই পড়তে আর ভাল লাগছিল না, সে ওপরে উঠে এল জিয়ার সঙ্গে গল্প করার জন্য।

জিয়ার টেবিলের সামনে চেয়ারে বসে কী যেন লিখছিল একটা খাতায়। সুলেখাকে দেখে তাড়াতাড়ি খাতাটা লুকিয়ে ফেলল।

সুলেখা সেটা লক্ষ্য করে বলল, কিছু লিখছিলেন বুঝি? এসে বিরক্ত করলাম।

জিয়া অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বলল, না, না, ও কিছু না। আপনি বসেন না!

হাত দিয়ে সে একটা চেয়ার থেকে ধুলো মুছে দিল।

সুলেখার কৌতূহল বেশী। তার চোখ তখনো খাতাটার দিকে। সে আবার বলল, গোপনে কিছু লিখছিলেন, যা আমার দেখা উচিত নয়?

জিয়া এবার হাসল। খাতাটা খুলে দিয়ে বলল, গোপন কিছুই না, আপনি দেখতে পারেন!

একটা কবিতা!

—আপনি কবিতা লেখেন ?

—এই একটু একটু!

—এত যুদ্ধ বিগ্রহ, রক্তারক্তি, এর মধ্যেও আপনাদের হাতে কবিতা আসে ?

—যে-কোন সময়েই কবিতা লেখা যায়।

—কবিদের হাতিয়ার তো কলম। আপনাকে তবু এই সময় রাইফেল্স ধরতে হবে?

জিয়া একটু ভাবের সঙ্গে বলল, আমার কলমটাই রাইফেল, আবার রাইফেলটাও কলম!

সুলেখা কবিতাটির ওপর একবার চোখ বোলাল, তারপর বলল, আমি অবশ্য কবিতা তেমন বুঝি না। সেদিন সুকুমারদা বলছিলেন সব গোপন কথা আমার জানা উচিত নয়, তাই আমি ভাবলাম, কোন গোপন ব্যাপার বুঝি দেখে ফেললাম!

জিয়া বলল, ও সেই চট্টগ্রামের অপারেশনটার কথা বলেছেন তো! আপনি সেটা এখনো মনে করে রেখেছেন?

—কেন মনে রাখব না? কেউ আমাকে অবিশ্বাস করলে আমার খুব খারাপ লাগে।

—না, আসলে সুকুমারদা নিজেই বোধহয় ভয় পাচ্ছিলেন। সেই ব্যাপারটা আসলে কী জানেন? আমাদের কয়েকজন ছেলে, যারা সাঁতার খুব ভালো জানে, তাদের আলাদা করে ট্রেনিং দেওয়া হচ্ছিল। খুব কঠিন ট্রেনিং। সমুদ্রের মধ্যে প্রায় তিরিশ মাইল সাঁতরাতে হবে—তাও অধিকাংশ সময় জলের নীচ দিয়ে···এদের বলে ফ্রগ ম্যান।

—সাঁতরে গিয়ে কী হবে?

—এখন খানসেনাদের যত সাপ্লাই আসছে জাহাজে—সবই আসছে চট্টগ্রাম পোর্ট দিয়ে। এই সব ফ্রগ ম্যানদের কাজ হবে উল্টোদিক দিয়ে গোপনে সাঁতরে গিয়ে চট্টগ্রাম পোর্টের কয়েকটা জাহাজ মাইন দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া। পরপর কয়েকটা জাহাজ ধ্বংস করে দিতে পারলে পোর্টটাই অচল হয়ে যাবে! আমি তো খুব ভাল সাঁতার জানি, তাই আমাকে এই ট্রেনিং-এর জন্য বাছা হয়েছিল।

—কিন্তু এ কাজ তো দারুণ রিস্কি! যারা যাবে তারা মারাও যেতে পারে!

—তা তো পারেই। কিন্তু দেশের জন্য মরতে কে ভয় পায়? আমি যাইনি অন্য কারণে!

সুলেখা একটু চুপ করে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আপনি এই গোপন ব্যাপারটা আমাকে বলে দিলেন কেন?

জিয়া মুখ নীচু করে বলল, তার কারণ, আপনাকে কোন ব্যাপারে অবিশ্বাস করার কথা আমি ভাবতেই পারি না!

এই সময় নীচ থেকে বিনতা দেবীর ডাক শোনা গেল, সুলেখা! সুলেখা! সুলেখা চেঁচিয়ে উত্তর দিল, যাচ্ছি!

তারপর জিয়াকে জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, একটা কথা বলুন তো! এই যে যুদ্ধটা হচ্ছে, এতে আমি কোন সাহায্য করতে পারি না? আমি তো শুধু শুধু বাড়িতেই বসে আছি—

জিয়া বলল, না, আপনি আর কী করবেন?

—কেন, কত বইতে পড়েছি, যুদ্ধের সময় মেয়েরাও অনেক কিছু করে—এমনকি নার্সিং।

—না, আপনারা শুধু শুধু কষ্ট করতে যাবেন কেন! এটা আমাদের দেশের ব্যাপার—আমাদেরই লড়াই করতে হবে, মরতে হবে।

—ও এটা আপনাদের যুদ্ধ? আমাদের কিছুই নয়? তবে আমরাও কেন এত উত্তেজিত হয়ে উঠি? কেন মনে হয়, আমরাও সবাই মিলে ঝাঁপিয়ে পড়ি।

—সেটা আমাদের সৌভাগ্য। আমাদের মধ্যেও তো এখন হাজারে হাজারে ছেলে এগিয়ে আসছে লড়াই করার জন্য। কিন্তু সকলকে দেবার মতন অস্ত্রও তো আমাদের নেই। তাছাড়া, এই কথাটা আমার আগেই বলা উচিত ছিল—আপনারা তো এই যুদ্ধে অনেক কিছু করছেন।

—কি?

—আমরা যারা যুদ্ধ করছি, তাদের সাহায্য করছেন?

—আমি আবার কি সাহায্য করছি? ছাই করছি!

নীচ থেকে আবার বিনতা দেবীর ডাক শোনা গেল।

সুলেখা এবার খানিকটা বিরক্ত ভাবে বলল, যাচ্ছি! যাচ্ছি তো বললাম!

তারপর জিয়ার দিকে ফিরেই বলল, আমি আপনাদের কিছুই সাহায্য করি নি।

তবে যদি কখনো কোনরকম সাহায্য করা আমার দ্বারা সম্ভব হয়, জানাবেন!

তারপর সুলেখা তরতর করে নীচে নেমে এল।

বিনতা দেবী দরজার কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। রুক্ষ গলায় জিজ্ঞেস করলেন, ওপরে কী করছিলি?

সুলেখা খানিকটা অবহেলার সঙ্গে বলল, এই জিয়ার সঙ্গে কথা বলছিলাম।

--আমি তখন থেকে ডাকছি, কানে শুনতে পাস না?

সাড়া দিয়েছিলাম তো!

-- শুধু সাড়া দিলেই হল? আসবার নাম নেই! ওর সঙ্গে তোর এত গল্প কিসের?

--অনেক গল্প আছে। ওরা কতরকম বিপদের মধ্য দিয়ে এসেছে।

—দ্যাখ খুকু, আমি অত আদিখ্যেতা পছন্দ করি না। তোরা সবাই মিলে কী আরম্ভ করেছিস?

--কিছু না তো! অনেক কিছুই করার ছিল, কিন্তু কিছুই তো করি নি!

—খবদার, আর একা একা ওপরে যাবি না।

—কেন, ওর সঙ্গে কথা বলায় তোমার এত আপত্তি কেন?

—আমি বলছি যাবি না!

মায়া বিছানা ছেড়ে উঠে এসেছে। উদ্বিগ্ন হয়ে জিজ্ঞেস করল, কী হয়েছে?

সুলেখা বলল, কিছু হয়নি তো! দিদি, তুমি আবার উঠে এলে কেন?

সুলেখা আলনা থেকে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেল।

বিনতা দেবী বললেন, ঢ্যাখ, ঐ ছেলেটার সঙ্গে খুকুর এত মেশা-মেশি আমি পছন্দ করি না। এসব মোটেই ভালো নয়।

মায়া বললো, মা, আস্তে, একটু আস্তে কথা বলো।

—কেন! আস্তে কথা বলবো কেন? নিজেদের বাড়িতে বসে সত্যি কথা বলতেও ভয় পাবো? তোরা ছেলেমানুষ, কিছু বুঝিস না।

—ঠিক আছে, আমি খুকুকে বলবো যেন জিয়ার সঙ্গে বেশী মেলামেশা না করে। কিন্তু তুমি যেন জিয়াকে কিছু বলতে যেও না!

বিনতা দেবী তবুও মুখটা গোমড়া করে রইলেন।

সুকুমার অফিসে বসে বসে একটা ছুটির দরখাস্ত লিখল। আগামীকাল থেকেই সে সাতদিনের ছুটি নেবে। ছুটি অনেক পাওনা আছে। বিনতা দেবী রোজই ছুটি নেবার কথা বলছেন। মায়ার যদি হঠাৎ দুপুরের দিকে ব্যথা ওঠে তখন ওরা খুব বিপদে পড়বেন। সুকুমারকে টেলিফোন করা হবে, তারপর সুকুমার আসবে—তাতে যদি অনেক দেরী হয়ে যায়? তিনি আর সুলেখা কলকাতায় নতুন—এখানকার হালচাল অত বেশী বোঝেন না।

অফিসের মালিক আজ নেই, তিনি একটা তদ্বিরে গেছেন দিল্লীতে। তাঁর ভাইপো মদনলালই এখন অফিসের উপনায়ক।

সুকুমার দরখাস্তখানা নিয়ে মদনলালের ঘরে ঢুকল। মদনলাল তার কাকার মতন সুস্থির নয়। দরখাস্তখানা দেখেই প্রায় লাফিয়ে উঠল—'আরে বাপ রে বাপ! ছুটি! এই টাইম মে ছুটি! আভি ইতনা টেণ্ডার, এখন আপনি ছুটি লিবেন! আপনি কি বলছেন সুকুমারবাবু। কেন ছুটি লিবেন কেন?'

যদিও ছুটি নেবার কারণটা দরখাস্তে লেখা আছে, তবু সেটা মুখে

বলতে লজ্জা পেল সুকুমার। তার সন্তান হবে, একথাটা যেন চট করে মুখ দিয়ে বেরোয় না। মদনলাল পুরো দরখাস্তটা পড়বেও না।

সুকুমার বলল, মদনলালজী, আমি গত এক বছরে একবারও একদিনের বেশী ছুটি নিইনি!

মদনলাল বলল, লিবেন, যত খুশী লিবেন—আগে এই হাঙ্গামাটা মিটে যাক। আরে শালা, লড়াইটা লাগবে লাগবে করে যে কিছুতেই লাগে না! এদিকে ব্ল্যাকআউট শুরু হয়ে গেল। লড়াইয়ের সময়ই তো আসল কাম হবে। এখনই তো সাপ্লাইয়ের মওকা। কাকা বলেছেন, আপনাদের সবাইকে বোনাস দিবেন, ডবল্ ডবল্।

সুকুমার বুঝল, তর্ক করে লাভ নেই। কোম্পানি এখন লাভের নেশায় উন্মত্ত। দেশে এখন কঠিন সমস্যা, লক্ষ লক্ষ মানুষ চরম দুর্ভাগ্যের মধ্যে রয়েছে, আর এরা সেই সময় কত বেশী লাভ করা যায় সেই স্বপ্ন দেখছে। সে যাই হোক, সে তো আর এদের আটকাতে পারবে না। সে চাকরি করতে এসেছে, চাকরি ছাড়লে তার সব কিছু বিপর্যস্ত হয়ে যাবে। বিশেষত তার প্রথম সন্তান জন্ম নিতে যাচ্ছে!

সে একটু কঠোরভাবে বলল, আমার উপায় নেই মদনলালজী। দরখাস্তটা পড়লেই ব্যাপারটা বুঝতে পারবেন। কাল থেকে আমি আসব না। আপনার কাকার সঙ্গে আমার কথা হয়ে আছে।

মদনলাল কাগজটার দিকে চোখ রাখল। তারপর জিজ্ঞেস করল, ছুটির সময় আপনি কলকাতাতেই থাকবেন তো? নাকি, বাইরে যাবেন!

সুকুমারের হাসি পেল। তার স্ত্রীর সন্তান হবে কলকাতায়, আর সেকি এই সময় বাইরে বেড়াতে যাবে নাকি? এদের মাথায় কিছু নেই। তবু বলল, কলকাতাতেই থাকব!

—ঠিক আছে। খুব জরুরৎ হলে আপনাকে বাড়িতে খবর

পাঠাব। এসে একটু দেখে দিয়ে যাবেন। আর আজ আপনি বেশীক্ষণ থেকে আপনার সব কাজ অবোধনারায়ণকে বুঝিয়ে দিয়ে যান। তাড়াতাড়ি পালাবেন না, অবোধনারায়ণের কাজ বুঝতে সময় লাগে—আমি আপনাকে ওভার-টাইম দিব—

আজ যে বেশীক্ষণ থাকতে হবে, তা সুকুমার ধরেই নিয়েছিল। টেবিলের সব কাজ পরিষ্কার না করে ছুটি নেওয়া তার স্বভাব নয়। অনেকগুলো চিঠির ড্রাফট করে দিয়ে যেতে হবে। অবোধনারায়ণকে সমস্ত প্রোগ্রামটা ছকে দিয়ে যেতে হবে।

পাঁচটার পর অফিসের সাত আট জন লোক রয়ে গেল। এর মধ্যে কয়েক জন আছে, সারাদিন তারা কোন কাজই করে নি, হঠাৎ ছুটির আগে কিছু জরুরি কাজের কথা তাদের মনে পড়ে যায়। মালিককে দেখাতেই মালিক সেই কাজ শেষ করে দিয়ে যেতে বলে। অর্থাৎ ওভারটাইমের লোভ। সকাল ন'টা থেকে রাত ন'টা এরা অফিসেই কাটিয়ে দেয়। জীবনে যেন আর কিছুই করার নেই এদের।

বেযারাকে দিয়ে কচুরি-তরকারি আব চা আনিয়ে খেয়ে নিল সুকুমার। তারপর কাজে বসে গেল। এদিকে ওদিকে দু'চার জন মাঝে মাঝেই কাজ থামিয়ে গুলতানিতে মেতে ওঠে -সেদিকে মন নেই সুকুমারের। দেশে এখন একটা বিরাট কাণ্ড চলছে, এক কোটির মতন রেফিউজি সীমান্ত জুড়ে তাঁবুর নীচে ধুঁকছে। বাংলাদেশের ভাগ্য নিয়ে সারা পৃথিবীতে ছিনিমিনি খেলা চলছে, আমাদের প্রধানমন্ত্রী পৃথিবীর শক্তিশালী দেশগুলিতে ঘুরে ঘুরে বাংলাদেশের সংকট মীমাংসার জন্য সাহায্য চেয়ে ব্যর্থ হয়ে ফিরে এলেন, তবু এরা এখানে বসে কী একটা সিনেমার গল্প নিয়ে হাসাহাসি করছে? এটা অসহ্য লাগে সুকুমারের। কিন্তু আপত্তি জানিয়ে লাভ নেই। সে কিছু বলতে গেলেই ওরা বলবে, আপনার তো ঐ দেশে বাড়ি ছিল। ওরা আপনার জাতভাই, তাই আপনার বেশী বেশী দরদ! সুকুমার

নিঃশব্দে কাজ করে যেতে লাগলো। সব কাজ তাকে আজ শেষ করে দিয়ে যেতেই হবে।

ছোকরা টাইপিস্ট তপেন এক সময় বলল, এবার উঠুন সুকুমারদা, রাত যে ন'টা বাজল?

সুকুমার চমকে উঠল। অ্যাঁ, ন'টা? বাড়িতে তো আজ বলে আসিনি যে আজ ফিরতে দেরী হবে। ওরা যদি চিন্তা করে। মায়া কেমন আছে? পাশের বাড়িতে টেলিফোন করে খবর নেবার জন্য সুকুমার টেলিফোনটা তুলল। টেলিফোনটা ডেড, কোন শব্দই হচ্ছে না। সুকুমারের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। যদি মায়ার কিছু হয়ে থাকে, ওরা তাহলে কী করে খবর দেবে? হয়তো এতক্ষণে অনেকবার চেষ্টা করেছে···

ঠিক এই সময় অফিসের বেয়ারা পরেশ ছুটতে ছুটতে এসে বলল স্যার, যুদ্ধ লেগে গেছে, যুদ্ধ।

সবাই এক সঙ্গে দাঁড়িয়ে উঠল। কী বলছিস? অ্যাঁ?

পরেশ বলল, নীচের রেডিওতে বলছে—যুদ্ধ লেগে গেছে, পাকিস্তান বোমা ফেলেছে আগ্রায়

সবাই হুড়মুড় করে চলে এল নীচে। পাশের দোকানে রেডিও বাজছে, তার সামনে বিরাট ভীড়। উদাত্ত গলায় সংবাদ পড়া হচ্ছে বেতারে···প্রধানমন্ত্রী আজ সন্ধ্যেবেলাতেও কলকাতায় ছিলেন, হঠাৎ সংবাদ পেয়ে দিল্লী চলে গেছেন—পাকিস্তান অতর্কিতে ভারতের বিভিন্ন বিমান বন্দরে বোমা ফেলেছে—তার উত্তরে ভারত যুদ্ধ ঘোষণা করেছে···আজ রাতে বারোটায় প্রধানমন্ত্রী নিজে জাতির উদ্দেশ্যে বেতার ভাষণ দেবেন।

পানের দোকানের ক্যালেণ্ডারে চোখ গেল সুকুমারের। আজ ৩রা ডিসেম্বর, ১৯৭১। একটি ঐতিহাসিক দিন।

সুকুমার আর অফিসে ঢুকল না। দ্রুত বাড়ির দিকে পা চালাল। রাস্তাঘাট অন্ধকার ঘুট-ঘুট করছে, হঠাৎ ব্ল্যাক-আউট শুরু হয়েছে।

এরই মধ্যে যাচ্ছে কিছু কিছু বাস আর গাড়ি—হেডলাইটের ওপর আলকাতরা লাগানো। মোড়ে মোড়ে মানুষের জটলা। কিন্তু কোথাও কোনো বিশৃঙ্খলা নেই। আশ্চর্য, এই ব্ল্যাক-আউটের মহড়ার সময়ও কোথাও একটা চুরি-রাহাজানি-বলাৎকারের কথা শোনা যায় নি, কোনো গাড়ির দুর্ঘটনা হয়নি। হঠাৎ কি এতবড় দেশটার সব মানুষ দায়িত্বপূর্ণ আর সুশৃঙ্খল হয়ে গেল! যুদ্ধ সবাইকে সজাগ করে দেয়। এরকম অবস্থা সুকুমার আগে কখনো দেখেনি।

ধর্মতলায় মোড়ে একদল লোক এই অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়িয়েই দারুণ তর্কাতর্কি করছে। তাদের মধ্যে একজন সিগারেট ধরাবার জন্য দেশলাই জ্বালতেই সেই আলোতে সুকুমার তাকে চিনতে পারলো। অনুপম!

সে গিয়ে অনুপমের কাঁধে হাত রাখতেই অনুপম ফিরে বললো, কে রে? ও, সুকুমার? খবর শুনেছিস?

এ খবর কি সারা কলকাতায় আর কারোর জানতে বাকি আছে? সবাই জানে যুদ্ধ বেঁধে গেছে। তবে যুদ্ধের লেটেস্ট খবর হয়তো অনুপম জানতে পারে। খবরের কাগজের লোকদের সঙ্গে অনুপমের যোগাযোগ আছে। পাকিস্তানীরা আগ্রায় বোমা ফেলেছিল। আগ্রার অবস্থা কী এখন?

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, আগ্রা ফল করে গেছে?

অনুপম বললো, অত সোজা? আমি এই মাত্র আনন্দবাজার অফিস থেকে খবর নিয়ে এলাম। রিপোর্টাররা কী বললো জানিস? পাকিস্তানীরা হঠাৎ আমাদের কয়েকটা এয়ারবেস অ্যাটাক করবে। এ খবর আমরা আগেই পেয়ে গিয়েছিলাম। তাই আমাদের সব প্লেনগুলো মাটির তলায় হ্যাঙ্গার তৈরি করে রাখা আছে। আর ওপরে কতকগুলো কাঠের তৈরি নকল ডামি প্লেন সাজিয়ে রাখা আছে। পাকিস্তানীরা সেগুলোর ওপর বোমা ফেলে ভাবলো, খুব করলাম!

—আর এদিককার খবর কী? ঢাকার দিকে?

—মুক্তি বাহিনীর সঙ্গে হাত মিলিয়ে আমাদের আর্মি বর্ডার ক্রশ করে ঢুকে গেছে। যশোর সেকটারে হেভি ফাইটিং হচ্ছে।

কিছুক্ষণ গল্পে মত্ত থাকবার পর সুকুমারের হঠাৎ খেয়াল হলো যে যুদ্ধের উত্তেজনায় সে তার নিজের বাড়ির কথাও ভুলে যাচ্ছে। মায়ায় এতক্ষণে কী হয়েছে কে জানে!

সুকুমার বললো, বাংলাদেশ স্বাধীন হবে। এটা আমাদের জীবনে দেখে যাবো! এটা আমি আশাই করিনি। এখনো মনে হচ্ছে স্বপ্ন।

অনুপম বললো, আজ আমি একটা ঐতিহাসিক ঘটনার সাক্ষী রইলাম।

—কী রে?

—চল, তোকে এগিয়ে দিতে দিতে বলছি।

অন্ধকারে খুব সাবধানে দেখে দেখে হাঁটতে হয়। নইলে হোঁচট খাবার সম্ভাবনা যখন তখন। তবু রাস্তায় এখন অসংখ্য মানুষ। যুদ্ধের খবর শুনে কলকাতা শুদ্ধ সব লোকই বুঝি রাস্তায় বেরিয়ে পড়েছে। অন্ধকার গ্রাহ্যই করছে না। ঠিক এই সময় ঢাকা শহরও নিশ্চয়ই অন্ধকার। কিন্তু সেখানে রাস্তায় একটাও সাধারণ মানুষ এখন আছে কি?

অনুপম বললো, আজ সন্ধ্যেবেলা আমার সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধীর দেখা হয়েছিল।

—যাঃ, সত্যি?

—আমি কি তোকে বানিয়ে বলছি? উনি আজ রাজভবনে বুদ্ধিজীবীদের ডেকেছিলেন? সেখানে আমিও ছিলাম।

অনুপম কলেজে পড়ায়। খবরের কাগজে প্রায়ই নানা রকম বিষয়ে প্রবন্ধ লেখে। সুতরাং তাকে নিশ্চয়ই বুদ্ধিজীবী বলা যেতে পারে। সেই তুলনায় সুকুমার নিছক একজন কেরানী। কলেজে

পড়ার সময় অনুপমের তুলনায় তার রেজাল্ট খারাপ ছিল না। কিন্তু সুকুমারের জীবনে উচ্চাকাঙ্ক্ষা নেই।

—আজ ময়দানে ইন্দিরা গান্ধীর মিটিং ছিল জানিস তো?

সুকুমার মনে মনে খানিকটা আফশোস করলো। খবরটা সে কাগজে দেখেছিল বটে। অফিসের কাজে মগ্ন হওয়ায় সে ভুলেই গিয়েছিল ব্যাপারটা। নইলে, সকালবেলা সে ভেবে রেখেছিল যে ঐ মিটিংটা শুনতে যাবে।

অনুপম বললো, ময়দানের মিটিং সেরে ইন্দিরা গান্ধী এলেন রাজ ভবনে আমাদের কাছে। আমরা প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ জন ছিলাম। সুচিত্রা সেন, উত্তমকুমার, মৃণাল সেন, সন্তোষকুমার ঘোষ আরও অনেক লেখক ছিলেন। ময়দানের মিটিং-এ বক্তৃতা দিয়ে এসে ইন্দিরা গান্ধী খানিকটা ক্লান্ত থাকলেও আমাদের সঙ্গে হাসিমুখে টুকটাক গল্প করছেন। আর ভেজা টিস্যু পেপার দিয়ে মুখ মুছছেন। এই সময় একজন পাঞ্জাবী মিলিটারী অফিসার জুতো মশমশিয়ে ঢুকলেন ঘরে। সোজা ইন্দিরা গান্ধীর কাছে গিয়ে তাঁর কাছে কী যেন বললেন। পরে জেনেছিলাম, ঐ অফিসারটিই জি ও সি ইস্টার্ন কমাণ্ড। সঙ্গে সঙ্গে ইন্দিরা গান্ধী উঠে দাঁড়িয়ে আমাদের বললেন আপনারা আমাকে মার্জনা করবেন। আজ আপনাদের সঙ্গে বেশীক্ষণ থাকতে পারছি না। একটা বিশেষ কাজে আমাকে যেতে হচ্ছে। আবার শিগগিরই কলকাতা এসে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হবো। আপনারা চা-টা খান।

এই কথা বলেই ইন্দিরা গান্ধী সেই অফিসারটির সঙ্গে বেরিয়ে গেলেন ঘর থেকে। দরজার কাছে মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থ রায় দাঁড়িয়ে। তিনিও কী যেন বললেন প্রধানমন্ত্রীর কাছে। অমনি প্রধানমন্ত্রী ছুটতে শুরু করলেন। আমরা দেখলাম, তিনজন একসঙ্গে ছুটছেন! তখন সাড়ে পাঁচটা কী পৌনে ছ'টা। তখনও ব্যাপারটা কী আমরা বুঝতে পারিনি। এই খানিকক্ষণ আগে খবরের কাগজের বন্ধু বান্ধবের

সঙ্গে একটু আড্ডা দিতে গিয়েছিলাম, সেখানেই যুদ্ধ ঘোষণার খবর পেলাম। সেই তখনই ইন্দিরা গান্ধী রাজভবন থেকে ছুটে বেরিয়ে একটা জিপ গাড়িতে চেপেছেন। সিদ্ধার্থ রায় নাকি নিজে সেই জিপ চালিয়ে নিয়ে গেছেন এয়ারপোর্টে। তক্ষুণি এয়ারফোর্সের একটা প্লেনে ইন্দিরা গান্ধী দিল্লী রওনা হয়ে গেছেন। তা হলে ভেবে ভাখ, সুকুমার, প্রধান মন্ত্রী আর আমরা যুদ্ধ লাগার মুহূর্তটিতে একসঙ্গে ছিলাম। এটা একটা বিরাট ব্যাপার নয়।

—নিশ্চয়ই !

—জিয়ার খবর কী ? ও নিশ্চয়ই এই খবর শুনে থাকবে ?

—ওরা তো এই খবরটারই প্রতীক্ষা করছিল। এক সময় ওরা নিরাশ হয়ে গিয়ে ভাবছিল, বুঝি ইন্দিরা গান্ধী আর যুদ্ধে নামবেনই না !

কথায় কথায় ওরা অনেকটা চলে এসেছে। অনুপম বললো, তুই এবার যা। আমি একটু ডান দিকে যাবো। একজনের সঙ্গে দেখা করতে হবে।

একা হয়ে পড়তেই সুকুমারের আবার ভীষণ ভাবে মনে পড়লো বাড়ির কথা। সেই অন্ধকারের মধ্যে সে ছুটতে শুরু করলো।

বাড়িতে ফিরে সুকুমার সিঁড়ি দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে উঠল। সুলেখা দরজা খুলতেই সে উত্তেজিত ভাবে বলল, জানো, যুদ্ধ বেঁধে গেছে !

সুলেখা শান্ত ভাবে বলল, জানি ! শিগগির ট্যাক্সি ডাকুন। দিদির খুব ব্যথা উঠেছে। আমি একবার বেরিয়েছিলাম, ট্যাক্সি পাইনি। মা আমাকে অন্ধকারের মধ্যে বেশীক্ষণ রাস্তায় থাকতে দিতে চান না।

সুকুমার ঘরের মধ্যে ঢুকে এক পলক শুধু মায়াকে দেখল। মায়া বিছানায় শুয়ে ব্যথায় মোচড়াচ্ছে।

আমি এক্ষুনি ট্যাক্সি ডেকে আনছি ! বলেই সুকুমার এক লাফে বেরিয়ে গেল।

কিন্তু মোড়ের মাথায় কোনো ট্যাক্সি নেই। রাস্তায় গাড়ি চলাচলও খুব কমে এসেছে। সুকুমার পাগলের মতন এদিক-ওদিক ছোটাছুটি করতে লাগল। পাড়ার এক ট্যাক্সিচালককে সে বলে রেখেছিল যে মাঝ রাতে দরকার হলে যেন তার ট্যাক্সি পায়। কিন্তু এখন তো রাত মাত্র সাড়ে ন'টা।

সেই ট্যাক্সিচালককে বাড়ি পাওয়া গেল না।

আজ একটা বিশেষ দিন। হয়তো ট্যাক্সিচালকরাও কোথাও গাড়ি থামিয়ে রেখে খবর শুনছে। রেডিওতে ঘন ঘন খবর বলা হচ্ছে। আজ আর অন্য কিছু চিন্তা করার অবকাশ নেই কারুর।

কিন্তু সুকুমার এখন যুদ্ধের কথা ভুলে গেছে। সে শুধু ভাবছে মায়ার কথা। যদি দু' এক মিনিট দেরী হলে মায়ার কোনো ক্ষতি হয়ে যায় ?

সুকুমারের তো এ ব্যাপারে কোনো ধারণাই নেই।

ব্রীজের মুখটা দিয়ে একটা প্রাইভেট গাড়িকে আসতে দেখে সুকুমার বেপরোয়া ভাবে গাড়িটার সামনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারের মধ্যে গাড়ির চালক সুকুমারকে নাও দেখতে পারতো, তবু শেষ মুহূর্তে সে ব্রেক করল। বিকট শব্দ হল ব্রেকের।

সুকুমার ধুলো ঝেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে জানালার কাছে ছুটে এসে ব্যাকুল ভাবে বলল, দেখুন, আমার উপায় ছিল না—আমার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে, যদি তাকে একটু নার্সিং হোমে পৌঁছে দেন, দয়া করে···আপনি যদি একটু···দয়া করে···

গাড়ির চালকই একমাত্র আরোহী। তিনি কয়েক মুহূর্ত স্থির ভাবে তাকিয়ে রইলেন সুকুমারের দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, আপনার স্ত্রীর প্রসব বেদনা উঠেছে বলে আপনার আত্মহত্যা করার কোনো কারণ আছে কি ?

—না, মানে, আমি।

—আপনি তো আত্মহত্যাই করতে যাচ্ছিলেন। নিন, উঠুন!

সুকুমার গাড়িতে উঠল। ভদ্রলোক তক্ষুণি গাড়ি না ছেড়ে ধীরে-সুস্থে একটা সিগারেট ধরালেন।

সুকুমার আবার ব্যাকুল হয়ে উঠে বলল, একটু যদি তাড়াতাড়ি—

ভদ্রলোক হেসে বললেন, আপনি একটু আগে যা করলেন, তার জন্য আমার হাত কাঁপছে, বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে। যদি আমি আপনাকে চাপা দিয়ে ফেলতাম! দাঁড়ান, আমাকে একটু সুস্থির হতে দিন।

একটু থেমে ভদ্রলোক আবার বললেন, আপনার চিন্তার কিছু নেই। আমি ডাক্তার।

সবাই মিলে ধরাধরি করে মায়াকে নামানো হল। যন্ত্রণায় মায়ার মুখের কষ দিয়ে তখন ফেনা গড়াচ্ছে। জ্ঞান নেই। ডাক্তারটি তবু বললেন, ডেলিভারি হতে এখনো অন্তত পাঁচ-ছ' ঘণ্টা দেরী আছে— বেশী ভাববেন না—

সুকুমার বলল, তবু এত যন্ত্রণা···

—বাঃ! একটি নতুন শিশু জন্মাচ্ছে, তার জন্য কষ্ট পেতে হবে না?

গাড়ি চলবার পর একটু শান্ত হয়ে সুকুমার সুলেখাকে জিজ্ঞেস করল, জিয়া কোথায়? সে এই সময় একটু সাহায্য করতে পারল না?

সুলেখা বলল, দুপুরবেলা একটা গাড়ি এসে ওকে ডেকে নিয়ে গেছে। ও বলে গেছে, আপনার সঙ্গে দেখা করে যেতে পারল না। ওর সঙ্গে আমাদের আর দেখা নাও হতে পারে!

॥ ৭ ॥

জিয়া ফিরল দু'দিন বাদে, দুপুরবেলা। সিঁড়ি দিয়ে উঠে এসে দুমদাম করে দরজায় ধাক্কা দিল। তার চুল উস্কো-খুস্কো, পরণে একটা খাকি শার্ট, কপালে একটা সদ্য কাটা দাগ, তাতে বেঞ্জিন আর তুলো লাগানো।

সুলেখা দরজা খুলতেই সে বলল, বৌদি কোথায়?

সুলেখা এক মুখ হেসে বলল, আপনি তো এখনো খবর শোনেন নি? দিদির একটা ছেলে হয়েছে, খুব সুন্দর, ফুটফুটে···

জিয়া চুপ করে দাঁড়িয়ে পড়ল। এই সময় ঠিক কী বলতে হয় সে জানে না। ঠিক কি করে প্রকাশ করা যায় আনন্দ?

সে শুধু বলল, বৌদি আর বাচ্চা দু'জনেই ভাল আছে তো?

—হ্যাঁ। বাবাঃ, যা চিন্তা হয়েছিল! ব্যথা উঠেছে পরশুদিন রাত্রে, আর বাচ্চা হল সকালে—

—সুকুমারদা নেই?

বাড়িতে সুলেখা তখন একা। সুকুমার, বিনতা দেবী দু'জনেই হাসপাতালে, সুলেখাও এতক্ষণ ছিল, একটু আগে ফিরে এসেছে রান্নাবান্নার জন্য।

জিয়া সব শুনে বলল, যাঃ, ওদের সঙ্গে তাহলে আর সত্যিই দেখা হল না। আমি অনেক কষ্টে ফিরে এলাম—আসবার কথা ছিল না—একটা জরুরী অর্ডার পৌঁছে দেবার জন্য···

—আপনার কপালটা কাটলো কি করে?

—ও কিছু না। একটা স্প্লিণ্টার লেগেছিল। দারুণ যুদ্ধ হচ্ছে—আপনারা তো টেরও পাচ্ছেন না। অথচ কলকাতার এত কাছে, মাত্র একশো মাইল।

—আসুন, ভেতরে এসে বসুন, দাঁড়িয়ে রইলেন কেন ?

জিয়ার মুখখানা হঠাৎ ম্লান হয়ে গেল। দরজা ধরে দাঁড়িয়ে একটু ইতস্ততঃ করে সে বললো, বাড়িতে আর কেউ নেই ?

সুলেখা বললো, না।

—আপনার মা ?

—না। মা-ও নেই। আজ সারাদিন নার্সিং হোমেই থাকবেন।

—তা হলে আমি আর ভেতরে যাবো না। চলি।

—কেন। ভেতরে আসবেন না কেন ?

—বাড়িতে আর কেউ নেই, আপনি একা···এসময়ে আমার থাকা ঠিক হবে না, আমি জানি, এটা অন্যায়।

সুলেখা হেসে ফেলে বললো, কিসের অন্যায় ? আপনাদের দেশে বুঝি এ সব ব্যাপারে খুব কড়াকড়ি আছে ? আমাদের এখানে এতে কেউ কিছু মনে করে না।

—আপনার মা কিছু মনে করতে পারেন।

এবার সুলেখারও মুখের হাসি মুছে গেল। মা কি জিয়াকে এর মধ্যে আড়ালে কোনো কঠোর কথা বলেছেন ? মায়ের ওপর খুব রাগ হলো সুলেখার ! মায়ের এমন সংস্কার ভরা মন ! কিছুতেই বদলাবেন না ! সংস্কার কি মানুষের মন থেকে সব মায়া দয়াও মুছে দেয়। জিয়ার মতন ছেলেদের মন এমনিতেই এখন খুব স্পর্শকাতর হয়ে আছে। ওদের নিজেদের মা—বাবা। আত্মীয়-স্বজন কোথায় কী অবস্থায় আছে, কোনো ঠিক নেই। এই সময় কারুর কাছ থেকে একটু নিষ্ঠুর ব্যবহার পেলেই মনে লাগে।

সুলেখা জিয়ার হাত ধরে বললো, আপনি ভেতরে আসুন। আমি বলছি, আমার কথা শুনবেন না ?

জিয়া দরজার ভেতরে পা দিল। তারপর স্থির চোখে তাকিয়ে রইলো সুলেখার মুখের দিকে। সুলেখাও চোখের পলক ফেলছে না। সে যেন জিয়া নামের একটি পরিচিত ছেলেকে দেখছে না।

সে দেখছে একজন স্বাধীনতার সৈনিককে। জিয়ার কপালে একটা লম্বা সদ্য কাটা দাগ। সেটাও যেন মানিয়ে গেছে তার মুখের সঙ্গে।

—আমাকে এক্ষুণি যেতে হবে।

—সে কি, খেয়ে যাবেন না? আমার ভাত হয়ে গেছে, ভাত আর আলু সেদ্ধ খেয়ে যান।

—না, উপায় নেই। আজকেই চুয়াডাঙ্গা ফল করতে পারে। আমি আজ বাগেরহাটে ঢুকবো। বড় ভাইয়ের কাছে খবর পাঠিয়ে দিয়েছি—

—কাগজে যে দেখলাম, খুলনাতেই সবচেয়ে বেশী লড়াই হচ্ছে।

—তা হোক না। আজই আমার জীবনের সবচেয়ে বড় যুদ্ধ।

একটু বসে যান অন্তত।

—উপায় নেই, নীচে গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। আমার দু'একটা জিনিস নিয়ে যাবো।

জিয়া ছাদে উঠে গেল। ফিরে এল একটু বাদেই। সুলেখা তখনও দরজার কাছে দাঁড়িয়ে।

জিয়া আর অপেক্ষা না করে বলল, চললাম। যদি বাঁচি তো দেখা হবে।

সুলেখা বলল—শুনুন।

সিঁড়ির দু'তিন ধাপ নেমেও জিয়া আবার ফিরে দাঁড়াল।

সুলেখা তার চোখের দিকে সোজাসুজি চেয়ে রইল। তারপর আস্তে আস্তে বলল, আমাকে একটা কথা দিয়ে যান। কথা দিন। সাবধানে থাকবেন?

জিয়া একটু থমকে গেল। তারপর বলল, এটা যুদ্ধ, এখন কি ওসব ভাবলে চলে। যদি মরি, তাতেও আনন্দ।

—তবু ইচ্ছে করে মরার কোন মানে হয় না। বলুন সাবধানে থাকবেন?

—আচ্ছা।

জিয়া আর দাঁড়াল না। দ্রুত নেমে গেল সিঁড়ি দিয়ে।

সুলেখা দৌড়ে চলে এলো রাস্তার দিকের বারান্দায়। ঝুঁকে পড়ে দেখলো জিয়াকে একটা জিপ গাড়িতে উঠতে। তারপর গাড়ীটা যতক্ষণ দেখা গেল সুলেখা সেই দিকে তাকিয়ে রইল।

সুলেখা ঈশ্বর টিশ্বর কিছু মানে না। পূজো আচ্চা করে না কখনো। তবু সেই সময় একটু ক্ষণের জন্য হঠাৎ তার ইচ্ছে হলো, কোনো একটা ঠাকুর দেবতার কাছে সে প্রার্থনা জানায় যেন জিয়ার কোনো বিপদ না ঘটে। কিন্তু কোন ঠাকুরের কাছে প্রার্থনা জানাবে সেটা ঠিক করতে পারলো না বলেই আর কিছু করা হলো না।

মায়ার ছেলের নাম রাখা হয়েছে জয়। পাঁচ দিন কেটে গেছে, ছেলে আর মা ত্ব'জনেই সুস্থ আছে।

সেদিন সকালবেলা সুকুমারদের অফিসের গাড়ি নিয়ে কয়েকজন সহকর্মী এসে হাজির। তারা যে চাঁদা তুলেছিল, সেই টাকায় জিনিসপত্র কিনে তারা বর্ডারে পৌঁছে দিতে যাচ্ছে। সুকুমারের যাবার কথা ছিল, সুকুমার কি যাবে?

সুকুমার একটু দ্বিধা করল। সকালে মায়াকে দেখতে যাওয়ার কথা। অবশ্য একটা সকালে না গেলেও চলে। শুধু বিনতা দেবী যদি একা যান--সুকুমার সন্ধ্যের আগেই ফিরে আসতে পারে—

কিন্তু বিনতা দেবী কি রাজি হবেন? সুকুমার বেশ একটু অস্বস্তিকর অবস্থার মধ্যে পড়লো। সে নিজেই উদ্যোগ করে অফিসে চাঁদা তোলার ব্যবস্থা করেছিল। সে নিজেই প্রস্তাব দিয়েছিল যে চাঁদাটা কোনো ফাণ্ডে জমা না দিয়ে ওষুধপত্র ও কাপড় জামা কিনে তারা নিজের হাতে মুক্তি যোদ্ধাদের দিয়ে আসবে। তখন অবশ্য মায়ার সন্তান জন্মানোর ব্যাপারটা তার মনেই আসে নি।

তার সহকর্মী তপন বললো, চলুন না দাদা, সঙ্গে গাড়ি আছে, আমরা বিকেলের আগেই তো ফিরে আসছি!

শাশুড়িকে কোনোদিন ভয় পায় নি সুকুমার। বিনতাদেবী সবসময়

তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার করেন। কিন্তু আজ সুকুমারের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগলো। তিনি যদি বলেন, নিজের স্ত্রী পুত্রের চেয়েও এই সব হৈ হল্লার প্রতি তোমার বেশী আগ্রহ ?

অনেক ভেবে চিন্তে সুকুমার একটা মিথ্যে বলা ঠিক করলো। সে বিনতা দেবীর ঘরে গিয়ে বললো। কাল সন্ধ্যেবেলা মায়া আমাকে বলেছে। আজ সকালে আমাকে যেতে হবে না নার্সিং হোমে। আমি গেলে আজ ও খুব রাগ করবে।

বিনতা দেবী অবাক হয়ে বললেন, কেন ?

সুকুমার অম্লান বদনে বললো, মায়া তো জানে আমার আজ বড়ারে জিনিসপত্র নিয়ে যাবার কথা। আমি যেতে চাইছিলাম না। কিন্তু মায়া মাথার দিব্যি দিল। ওর নিজেরই তো বেশী উৎসাহ ছিল।

বিনতা দেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, তা হলে তুমি যাও।

সুকুমারের বুক ধুক ধুক করতে লাগলো। বিনতা দেবী নিশ্চয়ই নার্সিং হোমে গিয়ে মেয়েকে এই কথাটা জিজ্ঞেস করবেন। মায়ার সঙ্গে সুকুমারের এ বিষয়ে কোনো কথাই হয় নি। তবু, মায়া কি বুঝতে পারবে না ? মায়া অস্বীকার করবে ? স্বামী স্ত্রীর মধ্যে যদি এটুকু বোঝাবুঝি না থাকে। তা হলে সে সম্পর্কের মূল্য কী ?

মায়া নিশ্চয়ই বুঝবে।

সুকুমার তার সহকর্মীদের বললো, বসুন, আমি এক্ষুণি তৈরি হয়ে নিচ্ছি।

কথাটা শুনেই সুলেখা একেবারে লাফিয়ে উঠল। অনুনয় করে বলল, সুকুমারদা আমি যাবো, আমি যাবো, আমাকে নিয়ে যেতেই হবে !

সুকুমার অবশ্য আগে থেকেই সুলেখাকে নিয়ে যাবার কথা ভেবে রেখে ছিল। তার আদরের শ্যালিকার এই সামান্য শখ সে মেটাতে পারবে না ?

বিনতা দেবী বললেন, না, না, অত সব গোলাগুলির মধ্যে মেয়েমানুষেরা কখনো যায় ?

সুকুমার তাড়াতাড়ি বলল, যাক না, কিছু হবে না!

সুলেখা তার মায়ের কোনো আপত্তিতেই কান দিল না সে যাবেই

অল্পক্ষণের মধ্যেই ওরা বেরিয়ে পড়ল. বড়াবে পৌঁছতে ঘণ্টা দু'এক লাগবে কিন্তু সুলেখার মনে হচ্ছে, পথ যেন আর শেষই হচ্ছে না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার প্রায় মুখে. বিভিন্ন জায়গায় এখন খণ্ড যুদ্ধ চলছে। কবে ঢাকার পতন হবে, সেইজন্য সকলের উদগ্রীব অপেক্ষা. ইতিমধ্যে বঙ্গোপসাগরে নাকি সেভেনথ ফ্লিট ঢুকছে—এই রকম একটা গুজব ছড়িয়েছে খুব। তা যদি সত্যি হয়, তাহলে যুদ্ধের গতি আবার কোনদিকে ঘুরে যাবে কে জানে!

বড়াবে এসে দেখলো, জায়গাটা একেবারে লোকে লোকারণ্য। ক্যাম্পগুলো থেকে সমস্ত রিফিউজিরা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। সকলের চোখে মুখে অধীর প্রতীক্ষা। সারে সারে মিলিটারির গাড়ি চলে যাচ্ছে পাশ দিয়ে।

এক জায়গায় একটি তিন বছরের শিশু বসে আছে, তাকে ঘিরে বিরাট ভিড়. সুলেখারাও কৌতূহলী হয়ে সেই ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল। শিশুটি সরল টলটলে দুটি চোখ মেলে অবাক হয়ে সবাইকে দেখছে।

একজন চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করল, খোকা, তোমার নাম কী ?

শিশুটি পরিষ্কার গলায় উত্তর দিল, সুবোধ দাস আমার মা কোথায় ?

কয়েকজন মহিলা কেঁদে ফেললেন।

শিশুটিকে পাওয়া গেছে নাভারোন থেকে। তের জন মৃত লোকের গাদার মধ্যে শুধু ঐ শিশুটি বেঁচে ছিল। খানসেনারা এসে

ঐ শিশুটির মা-বাবা সমস্ত আত্মীয়স্বজনকে গুলি করে মেরে রেখে গেছে—শিশুটিকেও নিশ্চয়ই তারা বাঁচিয়ে রাখতে চায় নি—কোনো ক্রমে গুলি লাগেনি তার গায়—পাঁচ দিন ধরে সেই মৃতের স্তূপের মধ্যে সে একলা বেঁচে ছিল, এমন অদ্ভুত তার জীবনীশক্তি। মুক্তি বাহিনীর ছেলেরা গিয়ে তাকে উদ্ধার করে এনেছে।

সুলেখারা ঘুরে ঘুরে দেখতে লাগল। ইছামতী নদীতে একটা নৌকো আসছে ওপার থেকে। কয়েকজন লোক তার ওপর আনন্দে লাফাচ্ছে। নৌকোটা কাছে আসতে দেখা গেল তার মধ্যে হাতে শিকল বাঁধা তিনজন খানসেনা।

বিশাল কর্কশ চেহারা, মাথার চুল ছোট করে ছাঁটা, গায়ে হালকা সবুজ রঙের পোশাক। দেখলে পাঠান বলে মনে হয়। ভীত ভীত বিহ্বল দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। ওরা একটা ঝোপের মধ্যে লুকিয়ে ছিল, সাধারণ মানুষের দল ওদের বন্দী করেছে।

নৌকো এসে ঘাটে ভিড়তেই দর্শকদের মধ্যে একজন লোক ছুটে গিয়ে রাগের চোটে ওদের একজনের গালে এক চড় কষালো। তারপর একটা ইঁট তুলে নিয়ে মারতে গেল।

কয়েকজন ভলান্টিয়ার এসে আটকালো লোকটাকে। লোকটা তখনও ছটফট করে বলছে, মারবো না? আমার বোন, আমার ফুফাকে খানসেনারা টেনে নিয়ে গেছে—মারবো না?

ভলান্টিয়াররা তবু লোকটিকে আটকে রেখে বলল, না, ওরা যুদ্ধবন্দী. ওদের বিচার হবে, এমনি মারা চলবে না।

এক জায়গায় সুলেখারা বর্ডার পেরিয়ে বাংলাদেশের মাটিতে পা দিয়ে এল। সুলেখা বলল, আ!

সুকুমার বলল, আমিও চব্বিশ বছর বাদে এই দেশে আবার পা দিলাম।

তারপরই সুকুমার আবার হেসে বলল, অথচ কিছুই না। একই রকম মাটি। এপারে ওপারে একই রকম সব কিছু··· অথচ এখানে

পা দিয়েও যেন শান্তি! অফিসের এক সহকর্মী বলল, আরে বাবা, একটু যাতায়াত করতে দিলেও তো এত দূর দূর মনে হত না। তা না, ভিসা, পাসপোর্ট—হ্যান ত্যান যত ঝামেলা! এখন নিশ্চয়ই সে সব আর থাকবে না।

পরেশবাবু বললেন, দেখুন, কিছুদিন বাদে আবার কি হয়। হয়তো ভিসা পাসপোর্ট সবই হবে।

সবাই পরেশবাবুর ওপর হা হা করে উঠল। সবাই ধমকে বলল, আপনি থামুন তো পরেশবাবু! সব ব্যাপারেই আপনার একটা উল্টো কথা বলা চাই। এখন ওরাও বাঙালী, আমারও বাঙালী।

পরেশবাবু বললেন, তোমরা এখন অতি উৎসবের চোটে লাফাচ্ছো বটে, কিন্তু আমি অতটা আশাবাদী নই। সবাই পরেশ-বাবুর দিকে অবাক চোখে তাকালো। এই সংশয়বাদীদের নিয়ে আর পারা যায় না!

সুলেখা এক সময় চুপি চুপি সুকুমারকে বলল, সুকুমারদা, এখানে জিয়ার খোঁজ করা যায় না?

সুকুমারেরও মনে মনে সেই রকম ইচ্ছে ছিল। কিন্তু এতবড় বর্ডার, এখানে জিয়ার কোথায় খোঁজ পাওয়া যাবে?

বর্ডারের এ-পাশে ও-পাশে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প। একটা ক্যাম্পের কাছে এসে একজনকে সুকুমার জিজ্ঞেস করল, আপনি জিয়াকে চেনেন? সেও আপনাদের মতন মুক্তি বাহিনীর···

সেই ছেলেটি বলল, জিয়া? পুরো নাম কি? কোন সেকটারে ছিল?

এই রে, জিয়ার পুরো নামটা তো মনে পড়ছে না সুকুমারের। এতদিন জিয়া জিয়া বলেই ডেকেছে।

কিন্তু সুলেখার মনে আছে। সে বলল, জিয়াউর রহমান!

মুক্তিবাহিনীর ছেলেটি বলল, শুধু নাম শুনে তো বোঝা যাবে না।

ঐ নামের অনেক ছেলে আছে। কোন্ সেকটর বলুন?

সেকটরের কথা তো জানি না। তবে কথা ছিল বাগেরহাটের দিকে অপারেশনে যাওয়ার।

ছেলেটি বললে, বাগেরহাট? তাহলে আট নম্বর ক্যাম্পে গিয়ে খোঁজ করে দেখুন। ওরা যদি বলতে পারে।

ব্লিচিং পাউডারের গন্ধ ম ম করছে চারদিকে। মানুষ মানুষ, অসংখ্য মানুষ। লক্ষ লক্ষ রিফিউজি তো আছেই, এ ছাড়া আছে নানা ধরনের সৈনিক, কলকাতা থেকেও এসেছে বহুলোক। এরই মধ্যে একটি রিফিউজি ক্যাম্প থেকে এক বৃদ্ধা ডেকে উঠলো, সুকু না? ও সুকু! সুকু!

সুলেখা বললো আপনাকে কে যেন ডাকছে সুকুমারদা!

সুকুমার পেছন ফিরে তাকালো। সেই বুড়ি দু'হাত ছাড়িয়ে ডাকছে, ও সুকু! সুকু!

সুকুমার ভুরু কুঁচকে বললো, চিনতে পারছি না তো। নিশ্চয়ই অন্য কারুকে ভুল করেছে।

ভিড়ের ঠেলায় ওরা আবার চলে গেল অন্যদিকে।

খুঁজে খুঁজে আট নম্বর ক্যাম্পটাও বার করা গেল। সেই ক্যাম্পের সামনে প্রচণ্ড ভিড়। কারণ তারা সদ্য বারোজন খানসেনাকে বন্দী করে এনেছে।

সুলেখা নিজেই সুকুমারের হাত ধরে সেই ভিড় ঠেলে ঢুকে গেল। নানা লোককে জিজ্ঞেস করে একেবারে হাজির হল ক্যাম্প কম্যাণ্ডারের সামনে। ক্যাম্প কম্যাণ্ডার ওদের মুখে জিয়াউর রহমানের নাম শুনে একটু চুপ করে রইলেন। তারপর জিজ্ঞেস করলেন, আপনারা জিয়াউর রহমানের কে হন? আত্মীয়?

সুকুমারের বুকের মধ্যে ধক্ করে উঠল। একথা জিজ্ঞেস করছে কেন? তাহলে কি জিয়া মারা গেছে?

ক্যাম্প কমাণ্ডারকে সুকুমার কী উত্তর দেবে? জিয়া তাদের কে হয়? কেউ না তো!

সুকুমার বলল, না, আত্মীয় নয় এমনি পরিচিত।

ক্যাম্প কম্যাণ্ডার উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, আসুন আমাদের সঙ্গে।

খানিকটা হেঁটে আর একটা ছোট তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, এটা একটা আমাদের হাসপাতাল। জিয়ার চোট লেগেছে, কিন্তু খুব মারাত্মক কিছু না। সেরে যাবে। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে কি, ও একটাও কথা বলছে না। দেখেন যদি আপনাদের চিনতে পারে বা কথা বলে।

একটু থেমে তিনি আবার বললেন, অনেক চেষ্টা করে, সাংঘাতিক বিপদের মধ্যে দিয়ে বাগেরহাট পৌঁছেছিল। কিন্তু তার মাত্র পাঁচ মিনিট আগে একটা গোলার ঘা খেয়ে ওর বড় ভাই মারা গেছে।

সুলেখার মুখখানা রক্ত শূন্য হয়ে গেল। সে চেপে ধরলো সুকুমারের হাত।

সুকুমার বললো, পাঁচ মিনিট আগে? বলেন কি?

ক্যাম্প কম্যাণ্ডার বললেন, আমাদের ছেলেরা খুলনা যশোরের চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়েছে। জিয়া আগে থেকেই খবর পেয়েছিল যে ওর বড় ভাই আছে বাগেরহাটে। বহুদিন তো নিজের কোনো আত্মীয় স্বজনকে দেখে নাই তাই দাদার কাছে যাবার জন্য প্রায় পাগল হয়ে উঠেছিল জিয়া। আমাদের ছেলেরা মেশিন গান চার্জ করতে করতে ঢুকে পড়েছে বাগেরহাটে. খানসেনারা তখন পিছু হটছে। ভিকট্রি আমাদের। গ্রামের লোকেরা আমাদের মুক্তি-বাহিনীর ছেলেদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল একটা আম বাগানের দিকে। ওখানেই ছিল লোকাল রেজিমেন্টের ঘাঁটি। জিয়ারা সেই দিকে দৌড়োচ্ছে, এমন সময় একটা মর্টারের শেল গিয়ে

পড়লো সেই আমবাগানে। এমনই নিয়তি, কী বলবো আপনাদের, সেই গোলার ঘায়ে মাত্র একজনই লোক মারা যায়, আর সেই লোকটিই জিয়ার দাদা।

সুকুমার কপাল কুকড়ে বললো, ইস্! দাদার সঙ্গে কথা বলতে পেরেছিল জিয়া?

কম্যাণ্ডার বললেন, না। স্পট ডেথ্। সঙ্গে সঙ্গে উনি মারা যান। জিয়া কিন্তু বিশ্বাস করতে পারে নি। সে ছুটে গিয়ে পাগলের মতন ওর বড় ভাইয়ের বুকের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে আর এলোমেলো কথা বলতে থাকে। কয়েক মিনিট পরেই সে আবার লাফিয়ে উঠে বলেছিল, বড় ভাইকে বাঁচাতেই হবে। চিকিৎসার দরকার। অন্যরা বোঝবার চেষ্টা করলো যে আর লাভ নেই, কিন্তু জিয়া কিছুতেই শুনবে না। এদিকে জিয়ার নিজের কাঁধেও একটা গুলি লেগেছিল, সেখান থেকে সমানে রক্ত গড়াচ্ছে, কিন্তু সেদিকে ওর ভ্রূক্ষেপ নেই। বাগেরহাট থেকে মাইল সাতেক এদিকে আমরা একটা মেডিক্যাল সেন্টার বসাতে পেরেছিলাম। জিয়া একাই তার বড় ভাইকে কাঁধে নিয়ে সেখানে যাবার চেষ্টা করে। তখন কাদের নওয়াজ নামে একটা ছেলে ওকে সাহায্য করতে এগিয়ে এলো। চিন্তা করে দ্যাখো সেই সাত মাইল রাস্তা, আজও গোলাগুলি চলছে, তার মধ্যে ওরা দু'জন সেই দেহটাকে ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে এলো। এ কি সহজ কথা! আসার সময় জিয়া অনবরত বলছিল, আজিজুল ভাই, আপনারে আমি বাঁচামু, কোন চিন্তা নাই, ঠিক বাঁচামু! মেডিক্যাল সেন্টারে পৌঁছবার পর সেখানকার ডাক্তার বললেন, তোমরা কষ্ট করে এতদূর নিয়ে এলে কেন? এতো অনেকক্ষণ আগেই মারা গেছে!

সুকুমারের মনে পড়লো একটা বইয়ের কথা। অল কোয়ায়েট অব দা ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট। সে বইতে ঠিক এরকম একটা দৃশ্য আছে। বাউল তার বন্ধু কাটসিনস্কিকে পিঠে নিয়ে কয়েক মাইল দূরের

হাসপাতালে পৌঁছাবার পর সেখানকার ডাক্তারও ঠিক এই রকমই কথা বলেছিল। সব যুদ্ধই বোধ হয় একই রকম। একই রকম নিষ্ঠুর আর বীভৎস।

সুলেখা জিজ্ঞেস করলো, তারপর?

কম্যাণ্ডার বললেন, সেই ডাক্তারটি জিয়াকে দেখে বললেন, তোমারই তো এক্ষুনি চিকিৎসা দরকার। তোমার এই অবস্থা, তার উপর এতখানি পরিশ্রম করলে··· । জিয়া সেই মুহূর্তে ঝুপ করে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেল। সেই যে অজ্ঞান হয়ে মুখ বন্ধ করলো তারপর জ্ঞান ফিরলো বটে কিন্তু আর কিছুতেই কথা বলে না। আমরা কত চেষ্টা করলাম। কিছুতেই কিছু হয় না।

সুকুমার বললো, যুদ্ধের সময় এরকম হয়, শুনেছি।

কম্যাণ্ডার বললেন, আপনারা যেতে চাইছেন বটে, কিন্তু আপনাদের দেখেও সে কথা বলবে কিনা সন্দেহ।

সুকুমার বললো, দেখাই যাক না চেষ্টা করে।

সুলেখা বললো, আমাদের দেখে সে নিশ্চয়ই কথা বলবে।

তাবুর দিকে কয়েক পা এগিয়ে সুলেখা থমকে দাঁড়ালো, হঠাৎ ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো সে। কাছ দিয়ে আজ যে সব লোকজন যাওয়া আসা করছিল, তারা একবার শুধু তাকিয়ে দেখলো সুলেখাকে, কিন্তু কেউ বিশেষ গুরুত্ব দিল না সেই কান্নার। যুবতী রমণীর কান্না একটি অতি সুন্দর জিনিস, কিন্তু যুদ্ধের সময় এ সব সৌন্দর্যেরও কোন মূল্য থাকে না।

কম্যাণ্ডার সুলেখার দিকে ফিরে বললেন, আপনারা যেন আবার উতলা হয়ে পড়বেন না। এখন উতলা হবার সময় নয়।

সুকুমার বললো, সুলেখা, তুমি বরং বাইরে দাঁড়াও···

সুলেখা তখনই চোখ মুছে ফেলে শান্ত গলায় বললো, না, আমি যাবো আপনার সঙ্গে।

তাঁবুর মধ্যে আট দশখানা খাটিয়া পাতা। আহতদের মধ্যে

দু'একজন কাতরাচ্ছে। এক কোণে একটা খাটে উপুড় হয়ে আছে জিয়া—তার বাঁ-হাত আর বুক পিঠ জোড়া ব্যাণ্ডেজ।

সুকুমার আর সুলেখা খাটের দু'দিকে দাঁড়াল, সুকুমার মুখ ঝুঁকিয়ে ডাকল, জিয়া! জিয়া!

সুলেখাও ডাকল, জিয়া!

কোন উত্তর নেই, জিয়া মুখ তুলে দেখল না।

সুকুমার কমাণ্ডারকে জিজ্ঞেস করল, ও কি ঘুমিয়ে আছে?

কমাণ্ডার বলল, না, ও সব সময় এই রকমই থাকে!

সুকুমার খুব সাবধানে জিয়ার গায়ে হাত রেখে বলল, জিয়া আমি সুকুমারদা সুলেখাও আমার সঙ্গে এসেছে।

জিয়া তবু কোন উত্তর দিল না।

ক্যাম্পটার মধ্যে মাছি ভন্ ভন্ করছে। ডেটল, পুঁজ আর রক্তের গন্ধ মিলে একটা দম আটকানো ভাব। সুকুমারের কষ্ট হচ্ছে খুব। বুকের মধ্যে অসহ্য কষ্ট। সে হঠাৎ মন ঠিক করে ফেলল।

সে কমাণ্ডারকে বলল, আমি কি জিয়াকে আমার সঙ্গে নিয়ে যেতে পারি?

আমার সঙ্গে গাড়ি আছে কলকাতায় নিয়ে গিয়ে যদি ওর চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়---

কম্যাণ্ডার তীক্ষ্ণ স্বরে বললেন, কেন, বাকি ছেলেগুলো কি দোষ করেছে? তারা এখানে পচে পচে মরবে—আর জিয়াউর একা ভাল চিকিৎসা পাবে—এর কি মানে হয়। আপনি এদের সবাইকে নিয়ে যেতে পারবেন?

সুকুমার বলল, সাধ্য থাকলে সবাইকে নিয়ে যেতাম—কিন্তু আমার যেটুকু সাধ্য, আমি শুধু সেটুকুই করতে চাই।

কম্যাণ্ডার সঙ্গে সঙ্গে অনুতপ্ত গলায় বললেন, মাপ করবেন। আমার এখন মাথার ঠিক নেই। দলে দলে ছেলেরা আহত হচ্ছে

কিংবা মরছে—জানি না কতদিন এ যুদ্ধ চলবে—কাদের নিয়ে আমরা যুদ্ধ চালাব ?

সুকুমার বলল, আর বেশী দিন নেই। আপনারা জিতবেনই।

কম্যাণ্ডার চিন্তিত মুখে বললেন, আপনারা ওকে নিয়ে যাবেন… ব্যাপারটা ইরেগুলার…একবার হেড কোয়ার্টারে জি ও সি কে জানানো দরকার…ওনারা যদি পারমিশান দ্যান।

সুকুমার বললো, দেখুন, ওসব ঝামেলা করতে অনেক সময় লাগবে, তাতে জিয়ার চিকিৎসার অযথা দেরি হয়ে যাবে। ওর ভালো চিকিৎসা হওয়াই আসল কথা। তাই নয় কি ?

—কিন্তু ওর দায়িত্ব কে নেবে ?

—আমি নিচ্ছি। আমি লিখে দিয়ে যাচ্ছি সব কিছু।

—ঠিক আছে, চলুন !

কম্যাণ্ডার নিজে জিয়াকে কোলে করে এনে সুকুমারদের গাড়িতে তুলে দিলেন। তারপর ফিসফিস করে বললেন, আমি এই ছেলেটাকে খুব ভালবাসতাম। তেজী ছেলে। দেখবেন যেন ওর সুচিকিৎসা হয়। আপনারা ওর কে হন বললেন না তো ?

॥ ৮ ॥

সুকুমারের এখন টাকাকড়ির খুব টানাটানি। অফিস থেকে যা ঋণ নিয়েছিল তা নার্সিং হোমের বিল মেটাতেই শেষ হয়ে গেছে। তবু সে জিয়ার চিকিৎসার কোন ত্রুটি করে নি। বন্ধুবান্ধব সবাইকে বলে সে দু'জন ডাক্তারের খোঁজ পেয়েছে, যাঁরা কোন ফি নেবেন না। দুই ডাক্তার দু'বেলা এসে দেখে যান। ওষুধ পত্তরও তাঁরাই দিচ্ছেন।

দুই ডাক্তারেরই অভিমত এই যে জিয়ার বাঁ-দিকের ঘাড়ে যে ক্ষত হয়েছে, তা মারাত্মক কিছু নয়। কিছুদিনের মধ্যেই শুকিয়ে যাবে, হাতটারও কোন ক্ষতি হবে না। কিন্তু মানসিক আঘাতটাই বেশী। তাকে দিয়ে কথা বলানো দরকার।

জিয়ার খবরটা অনুপমকে জানিয়েছিল সুকুমার। কিন্তু অনুপম আসতে পারে নি, সে এখন দারুণ ব্যস্ত। সীমান্তের কাছেই সে প্রায় সর্বক্ষণ থাকে। সুকুমারকে অনুপম খবর পাঠিয়েছিল যে জিয়ার চিকিৎসার জন্য কোন টাকা পয়সা লাগবে কি না। অনুপমের উদ্যোগে কলকাতার সমস্ত টাকা জমা দিয়েছে বাংলাদেশ ফাণ্ডে। সেখান থেকে অনুপম কিছু টাকা দিতে পারে। সুকুমার রাজি হয় নি। তার নিজের যতদূর সাধ্য সে করবে।

সুকুমার আর সুলেখা সব সময় নানা রকম চেষ্টা করছে জিয়াকে দিয়ে কথা বলানোর। এখনো কোন ফল পায় নি। জিয়া বিছানায় উপুড় হয়ে মুখ গুজে পড়ে থাকে, একটুও সাড়া শব্দ করে না—মাঝে মাঝে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। এক এক সময় দেখা যায়, তার বালিশ ভিজে গেছে চোখের জলে।

সকালে বিকেলে মায়াকে নার্সিং হোমে দেখতে যায় সুকুমার। সুলেখা তখন বাড়িতেই থাকে, কারণ জিয়াকে একা ফেলে রেখে যাওয়া যায় না।

মায়া প্রত্যেক দিনই জিজ্ঞেস করে জিয়ার কথা। একদিন সে বললো, জিয়াকে একদিন এখানে নিয়ে এসো না! ছেলেটাকে দেখতে ইচ্ছে করে।

মায়াকে সব ব্যাপারটা জানানো হয় নি! মায়া শুধু জানে যে জিয়া সামান্য আহত অবস্থায় ফিরে এসেছে।

বিনতা দেবীকে নিয়ে খুব ভয় ছিল সুকুমারের। মায়া বাড়িতে নেই, এখন তাদের সংসারে বিশৃঙ্খল অবস্থা, এর মধ্যে একজন গুরুতর অসুস্থ মানুষকে বাড়িতে রাখা সোজা কথা নয়। বিনতা দেবী রাগ করলে সেটাও হতো না। কিন্তু উনি চুপ করে আছেন ব্যাপারটা সম্পর্কে। ভালো মন্দ কিছুই বলেন নি।

সুকুমার চেষ্টা করেছিল জিয়াকে কোনো ভালো হাসপাতালে ভর্তি করে দেবার। কিন্তু কোনো হাসপাতালেই সীট খালি নেই। অনেককে ধরাধরি করেও বিশেষ কিছু হয়নি। তাছাড়া, সুলেখা চায় না জিয়া হাসপাতালে যাক। সুলেখা মন প্রাণ দিয়ে জিয়ার সেবা করছে। সুলেখার মা কবে এই নিয়ে আবার রাগারাগি করবে, সুকুমারের সেই ভয় আছে।

রাস্তাঘাটে, বাজারে, সব জায়গাতেই শুধু যুদ্ধের আলোচনা। এমন কি নার্সিং হোমে পর্যন্ত। এখানেও একটা রেডিও রাখা রয়েছে, রুগীরা ঘন্টায় ঘন্টায় খবর শুনতে চায়। এক একটা জায়গা পতনের সংবাদ আসে আর সবাই উল্লাসে চিৎকার করে উঠে।

মায়ার এক মাসতুতো দাদা একদিন নার্সিং হোমে দেখতে এলেন মায়াকে। এঁর নাম বাসুদেব চৌধুরী, বেশ অবস্থাপন্ন, ইলেকট্রিক গুড্‌সের ব্যবসা করেন। সুকুমার দু'একবার এর বাড়িতে গেছে মাত্র, ধনী আত্মীয় কুটুম্বদের সঙ্গে সে বিশেষ সম্পর্ক রাখে না।

বাসুদেব চৌধুরী মায়াকে দেখতে এসেছেন নিছক কর্তব্যের খাতিরে। অনেক কিছু উপহার এনেছেন মায়ার স্বাস্থ্যের জন্য। বাসুদেব চৌধুরী বিনতা দেবীকে নিজের বাড়িতে নিয়ে গিয়ে রাখতে চান, কিন্তু বিনতা দেবী এখন যেতে রাজি হননি।

নার্সিং হোম থেকে বেরিয়ে বাসুদেব চৌধুরী সুকুমারকে বললেন, দুশ্চিন্তায় দুশ্চিন্তায় তোমার মুখখানা কালো হয়ে গেছে সুকুমার।

কিছু উত্তর না দিয়ে সুকুমার এমনি একটু হাসলো।

বাসুদেব চৌধুরী বললেন, প্রথম সন্তান তো, খানিকটা দুশ্চিন্তা হবেই। চলো আমার সঙ্গে ক্লাবে চলো, মনটা ভাল হয়ে যাবে, এখন সন্ধ্যাবেলা তো তোমার কিছু করবার নেই।

তিনি তাঁর গাড়ির দরজা খুলে দিলেন।

বিনতা দেবী একটু আগে বাড়ী ফিরে গেছেন। সুকুমার একা। আজ জিয়া সারাদিন কিছুই খায়নি, সেজন্য তার মনটা বিষণ্ণ হয়ে আছে।

সে বললো, না দাদা, আমাকে এখন বাড়িতে ফিরতে হবে।

—কেন? বাড়ি ফিরে কি করবে? গিন্নি নেই বাড়িতে।

—বাড়িতে আর একজন অসুস্থ রুগী আছে।

—কে?

সুকুমার সব ব্যাপারটা খুলে বললো।

শুনতে শুনতে গম্ভীর হয়ে গেলেন বাসুদেব চৌধুরী। তিনি একটা সিগারেট ধরিয়ে নিলেন। তারপর বললেন, হু, এই ব্যাপার। একজন আহত মানুষের চিকিৎসার সাহায্য করছো, সেটা অবশ্য ভালোই। কিন্তু এই যুদ্ধের ব্যাপারে তুমি খুব মেতে উঠেছো মনে হচ্ছে?

বাসুদেব চৌধুরীর গলায় ব্যাঙ্গের সুর দেখে একটু আহত হলো সুকুমার। সে বললো, কেন, আপনার বুঝি উৎসাহ নেই? তা হলে আপনিই একমাত্র ব্যতিক্রম মনে হচ্ছে

—যুদ্ধে না নেমে ইন্দিরা গান্ধীর কোনো উপায় দিল না, সেটা আলাদা ব্যাপার। কিন্তু এই যুদ্ধ নিয়ে এত মাতামাতি করার কোনো কারণ আছে কি? আমাদের এদিকে যারা মাতামাতি করছে, আমার মতে তারা নির্বোধ। এই যুদ্ধে আমাদের কী লাভ হবে?

—এখানে লাভ লোকসানের কোনো প্রশ্ন নেই। এই যুদ্ধটা হচ্ছে একটা আদর্শের জন্য।

—বাজে কথা বলো না! আদর্শ টাদর্শ হচ্ছে খবরের কাগজের কথা! আর রেডিওতে ঐ যে লোকটা গলা কাঁপায়....। মানুষ সব সময় লাভ লোকসানের চিন্তা করেই চলে। তোমার তো বাড়ি ছিল পূর্ব বাংলায়, তুমি কি আশা করছো, যুদ্ধ থামলে তুমি সেই বাড়ি ঘর আবার ফিরে পাবে?

—না, বাসুদেব দা, আমি সে রকম আশা করি না। যারা সে রকম আশা করছে, তারাই নির্বোধ!

—কুমিল্লায় আমাদের বাড়িটা দেখলে তুমি একথা বলতে পারতে না, সুকুমার। আমাদের তিন পুরুষের বাড়ি, দো-মহলা, সামনে বিরাট আট চালা, আর কত বড় বাগান, প্রায় বারো বিঘের ওপর, কত রকম ফলের গাছ ছিল সেখানে, আরও কত রকমের গাছ নিজের হাতে লাগিয়েছিলেন, সেই বাড়ি আমাদের এমনি এমনি ফেলে আসতে হলো।

সুকুমার চুপ করে রইলো।

—পাকিস্তানের পরেও আমরা বছর সাতেক ছিলাম। এক মাসে পর পর তিনবার ডাকাতি হলো আমাদের বাড়িতে। পুলিশে খবর দিয়ে কোনো লাভ নেই। এমন কি থানায় আমাদের কেসই লিখলো না। উল্টে আমাদের বাড়ির বন্দুকটা বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেল। জেলা সদরে খবর দিতে গেলাম, সেখানকার পুলিশের কর্তা আমাকে কী বললে জানো? সে বললো, আমি হিন্দুস্তানের চর, তাকে পঁচিশ হাজার টাকা ঘুষ না দিলে আমাকে তক্ষুনি জেলে

ভরবে। অনেক দরাদরি করে দশ হাজার টাকা দক্ষিণা দিয়ে আমি সেবার ছাড়া পাই। পরের মাসেই আবার ডাকাতি হলো, আমার বাবাকে কুপিয়ে কুপিয়ে কেটে ফেললো। ডাকাতরা সবাই আমার চেনা, অথচ কোনো প্রতিকার হবে না। বাড়ি জমি বিক্রি করেও কোনো উপায় নেই। হিন্দুর সম্পত্তি কেউ কিনবে না। বাধ্য হয়েই সব কিছু ফেলে একদিন চলে আসতে হলো আমাদের। বলো তো, পৃথিবীর কোনো সভ্য দেশে এরকম হয়? বলো? আমাদের সেই দুঃখ আমরা ভুলতে পারি?

সুকুমার আস্তে আস্তে বললো, এদিক থেকেও অনেককে চলে যেতে হয়েছে ওদিকে। অনেক ট্র্যাজেডি দু' দিকেই ঘটেছে।

বাসুদেব চৌধুরী হুংকার দিয়ে বললেন, এদিক থেকে ওদিকে গেছে? ক'জন গেছে? এদিকে সম্পত্তি বিক্রি করায় কোনোদিন নিষেধ হয়েছে? এদিকের মতন লক্ষ লক্ষ লোক ওদিকে রিফিউজি ক্যাম্পে থেকেছে?

— বাসুদেব দা, এখন এসব আলোচনার কোনো মানে হয় না! ইতিহাসের একটা নিষ্ঠুর ট্র্যাজেডি ঘটে গেছে এক সময়। কিন্তু ইতিহাস অনবরত বদলায়। পুরোনো কথা আঁকড়ে ধরে থেকে কোনো লাভ নেই। তাতে মনের তিক্ততাই শুধু বাড়বে। এখন ওসব হিসেব নিকেশ ভুলে যান। ভাইয়ে ভাইয়ে ঝগড়া হয়, আবার বাইরে থেকে বিপদ এলে ভাই ঠিক ভাইয়ের পাশে দাঁড়ায়। ওরা স্বাধীনতার জন্য লড়ছে, এখন আমরা ওদের পাশে দাঁড়াবো না?

—রাখো তোমার ঐ সব বড় বড় কথা। এই যুদ্ধের জন্য আমাদের দেশের কোটি কোটি টাকা খরচ হচ্ছে, এ তো আমাদের ট্যাক্সের টাকা কিন্তু এর বদলে আমরা কী পাবো? পাবো শুধু বদনাম। তুমি দেখে নিও, আমি বলে দিলাম! তোমরা এখন লাফাচ্ছো---

—আপনাকে একটা ঘটনা বলি শুনুন! বনগাঁ বর্ডারে আমি

কিছুদিন আগে গিয়েছিলাম, তখনও যুদ্ধ লাগে নি। ওপার থেকে লাখ লাখ লোক পালিয়ে এসে এদিকে ক্যাম্পে আছে, তাদের মধ্যে অনেক হিন্দু মুসলমান, পাশাপাশি তাঁবুতে থাকে, কোনো রকম গোলমাল নেই। এটা কী করে সম্ভব হলো? বলুন! যাই হোক, আমি সেদিন হরিদাসপুরে একটা গাঁয়ের দোকানে বসেছিলাম অনেকক্ষণ। দোকানদারের নামটা আমার এখনো মনে আছে, ধীরেন দাস। তার সঙ্গে অনেক গল্প হয়েছিল আমার। তার বাড়ি ছিল বরিশাল, সেও ঘর বাড়ি ফেলে চলে এসেছে এদিকে, সেই উনিশ শো পঞ্চাশ সালে। ঠিক আপনারই মতন ডাকাতের অত্যাচারের কথা বলছিল সে। আমাদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হঠাৎ এক সময় সে লাফিয়ে উঠলো। চেঁচিয়ে বললো, আরে ও কে? কাশেম আলী না? আমরা তাকিয়ে দেখলাম, বর্ডারের ওপার থেকে কয়েকজন লোক দৌড়োতে দৌড়োতে আসছে, তার মধ্যে একজন লুঙ্গি পরা লম্বা মতন লোক আসছে খোঁড়াতে খোঁড়াতে, বোধ হয় তার কোনো পায়ে চোট লেগেছিল। সেই দোকানদারটি বললো, হ্যাঁ, ঐ তো কাশেম আলী। আমরা ভয় পেয়ে গেলাম। ধীরেন দাস বোধ হয় তার কোনো পুরোনো শত্রুর দেখা পেয়েছে, এবার বোধ হয় একটা গোলমাল লেগে যাবে। আমরা ধীরেন দাসকে ধরতে গিয়েছিলাম পর্যন্ত, কিন্তু আমাদের হাত ছাড়িয়ে সে ছুটে বেরিয়ে গেল। তারপর সেই লুঙ্গি পরা লোকটাকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে প্রায় কেঁদে উঠে বললো, কাশেম! কাশেম রে! তুই বেঁচে আছিস। আর কোনো দিন তোকে দেখবো ভাবিনি! সেই লোকটাও বললো, ধীরেন ভাই! ধীরেন ভাই! আমি সারা রাস্তা আপনার কথা ভাবতে ভাবতে আসছি! তারপর দু'জনে মিলে কী কান্না! তা দেখে আমাদেরও চোখে জল এসে গিয়েছিল। বাসুদেব দা, এ রকমও তো হয়! মানুষের ইতিহাস এ রকমই বিচিত্র!

বাসুদেব চৌধুরী বললেন, চীপ সেন্টিমেন্ট! এই জন্যই বাঙালী জাতটা উচ্ছন্নে গেল। তুমি শুধু এ রকম একটা ঘটনা দেখলে। আরও যে হাজার হাজার কত রকম ঘটনা……

শেষ পর্যন্ত বাসুদেব চৌধুরীর সঙ্গে ঝগড়াই হয়ে গেল সুকুমারের। তর্ক এতদূর পর্যন্ত গড়ালো যে তারা দু'জনে আত্মীয়তা ভুলে গিয়ে গালাগালি শুরু করে দিল। সুকুমার বললো, যান, যান! আপনার মতলব আমি জানি। আপনারা ব্যবসায়ীরা চান বিরোধটা জিইয়ে রাখতে, তাতেই আপনাদের লাভ বেশী! স্বার্থ ছাড়া আপনারা কিছুই বোঝেন না।

বাসুদেব চৌধুরী বললেন, ইডিয়েটের মতন কথা বলো না, ওরা ধর্ম ছাড়া আর কিছু বোঝে না। ওরা হিন্দুদের কোনোদিন সহ্য করবে না। হয়তো শেষ পর্যন্ত হাতাহাতি পর্যন্ত লেগে যেতে পারতো, কিন্তু সেই সময় একটু দূরে একটা রেডিওর দোকানের সামনে ভিড় করে থাকা কিছু লোক রেডিও'র কোনো একটা ঘোষণা শুনে উল্লাসে চিৎকার করে উঠলো। সুকুমার অমনি দৌড়ে গেল সে দিকে।

চট্টগ্রাম শহরের পতন হয়েছে। খান সেনারা চট্টগ্রাম ছেড়ে পালিয়েছে সেদিন দুপুরে।

বাড়িতে গিয়ে তক্ষুণি খবরটা জিয়াকে দিতে ইচ্ছে হলো সুকুমারের। জিয়ার ঘরে একটা ট্রানজিস্টার রেডিও রেখে দিয়েছে সুকুমার। প্রায় সব সময়ই সেটা খোলা থাকে। কিন্তু জিয়া কোনো উৎসাহ দেখায় না। সে একই রকম ভাবে বালিশে মুখ গুঁজে শুয়ে থাকে। রেডিওতে নানা রকম চমকপ্রদ ঘোষণা হয়, তবু সে কোনো সাড়া শব্দ করে না।

বাড়ি ফিরে সুকুমার সোজা উঠে গেল ছাদে। জিয়ার ঘরে আলো নেভানো। তবু সুকুমার ঘরে ঢুকে উত্তেজিত ভাবে বললো, জিয়া! জিয়া! খবর শুনেছো! চট্টগ্রাম এখন স্বাধীন! তোমরা অনেক চেষ্টা করেছিলে···এখন তোমার আনন্দ হচ্ছে না?

জিয়া কোনো উত্তর দিল না।

সুকুমার তবু দু'হাত দিয়ে তাকে ঠেলতে ঠেলতে বললো, জিয়া! জিয়া! ওঠো! চট্টগ্রাম! চট্টগ্রাম এখন তোমাদের! জিয়া!

সুকুমারের নিজেরই অসম্ভব আনন্দ হচ্ছে। চট্টগ্রাম জয় মানে বেশ বড় রকমের জয়। এই চট্টগ্রামেই প্রথম হঠাৎ জিয়াউর রহমান নামে একজন মেজর রেডিওতে স্বাধীনতা ঘোষণা করেছিল এবং রবীন্দ্র সংগীত বাজানো হয়েছিল। তারপরই চট্টগ্রামে সাঙ্ঘাতিক লড়াই শুরু হয়ে যায়। মার্কিন দেশ পাকিস্তানী সৈন্যদের সাহায্য করার জন্য সেভেন্‌থ ফ্লিট পাঠাবে এ রকম একটা গুজব উঠেছিল। সেভেন্‌থ ফ্লিটকে আসতে হলে ঐ চট্টগ্রাম বন্দর দিয়েই আসতে হতো। চীন আর আমেরিকা দু'জনেই পাকিস্তানকে কেন সাহায্য করতে চায়, সুকুমার সেটা কিছুতেই বুঝতে পারে না! ভিয়েৎনামের ব্যাপারে চীন আর আমেরিকা সাঙ্ঘাতিক শত্রু, অথচ বাংলাদেশের ব্যাপারে তাদের উদ্দেশ্য একই। আশ্চর্য!

সুলেখা সারাদিন জিয়ার পাশে বসে থেকে তার সেবা করে। ঠিক ঘড়ি ধরে ওষুধ খাওয়ায়। জিয়া ওষুধ খেতে চায় না। তখন সুলেখা প্রায় জোর করে তার ঠোঁট ফাঁক করে ঝিনুকে করে ওষুধ খাইয়ে দেয়।

সুকুমার এক এক সময় বলে, সুলেখা, তুমি বড্ড বেশী পরিশ্রম করছ। এতে যদি তোমার আবার শরীর ভেঙে যায়? মাঝে মাঝে তো তোমারও বিশ্রাম দরকার।

সুলেখা ম্লান হেসে উত্তর দেয়, সুকুমারদা, আমার খুব ইচ্ছে ছিল, এই যুদ্ধের সময় আমিও কিছু একটা করি। অন্তত নার্সের কাজ। তা তো করা হল না, তবু যদি অন্তত একজনের সেবা করেও —

সুকুমার বলল, তা জানি। কিন্তু তোমার মা যদি আবার রাগারাগি করেন—

—মায়ের কথা বাদ দিন! মায়েদের সব কথা শুনলে কি চলে?

সুকুমার ক্ষীণ ভাবে হাসলো। তারপর বলল, আমার সবচেয়ে দুঃখ হচ্ছে কি জানো? দু'একদিনের মধ্যেই ঢাকার পতন হবে— ঢাকার আশে পাশে আমাদের ছত্রীবাহিনী নেমে গেছে—জেনারেল নিয়াজীর আর আশা নেই—

সুলেখা অবাক হয়ে বলল, এতে আপনার হঠাৎ দুঃখ হতে যাবে কেন?

—না, মানে, এ-রকম একটা চরম আনন্দের সময়—জিয়ার মতন লক্ষ লক্ষ ছেলে সেই মুহূর্তটার জন্য অপেক্ষা করে ছিল এতদিন, কিন্তু মুহূর্তটা যখন আসবে—তখন জিয়া টের পাবে না!

সুকুমার একটু গলা চড়িয়ে বলল, জানো জিয়া, তোমাদের স্বাধীনতার আর দেরি নেই!

জিয়া তবু মুখ ফেরালো না।

সুলেখা বলল, কিন্তু সেভেন্থ ফ্লিট? আর এদিক থেকে যদি চাইনীজরা আক্রমণ করে?

—কেউ আসবে না। অন্য দেশের জন্য কেউ চট করে লড়াই করতে আসে না। শুধু মুখেই যত কিছু! ভিয়েৎনামে আমেরিকানদের যথেষ্ট শিক্ষা হয়ে গেছে!

—আচ্ছা সুকুমারদা, যুদ্ধ যেদিন শেষ হবে, সেদিন বিরাট একটা উৎসব হবে না?

—নিশ্চয়ই হবে!

—আমরা সেদিন কিন্তু আবার বর্ডারে যাবো!

—তা না হয় যাবো। কিন্তু জিয়া তো পারবে না। ওকে ফেলে রেখে আমরা কী করে যাবো!

সুলেখা আর সুকুমার দু'জনেই জিয়ার দিকে তাকিয়ে রইল। জিয়া তবু কোনো সাড়া-শব্দ করল না। উপুড় হয়ে শুয়েই আছে এক রকম ভাবে। সে তার মুখ যেন কারুকে দেখাতে চায় না। সে ওদের কথা শুনতে পাচ্ছে কিনা তাও বোঝবার উপায় নেই।

দুপুরবেলা খেয়ে দেয়ে উঠে একটা সিগারেট ধরিয়ে টানছিল সুকুমার। হঠাৎ এক সময় সে খুব চমকে উঠলো। একটা ব্যাপারে তার তো খুব ভুল হয়ে গেছে। বর্ডার ক্যাম্প থেকে যেদিন সে জিয়াকে নিয়ে এলো, তারপর তো আর বাংলাদেশ মিশনকে কোনো খবর জানানো হয়নি। এ কাজটা বে-আইনী নয় তো! জিয়া বাংলাদেশ মুক্তি বাহিনীর সৈনিক, জিয়ার চিকিৎসার ব্যাপারে ওদের কাছ থেকেও কিছু পরামর্শ নেওয়া দরকার।

সবাই যুদ্ধ নিয়ে দারুণ ব্যস্ত, এখন কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে? বাংলাদেশ মিশনে যাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে সুকুমারের কেউ চেনা নেই। অনুপমটাকে ধরতে পারলে হতো, কিন্তু তার তো পাত্তাই পাওয়া যায় না।

তবু সুকুমার বেরিয়ে পড়লো অনুপমের বাড়ির উদ্দেশ্যে।

সেখানে কেউ নেই। অনুপমের ফ্ল্যাট একেবারে ফাঁকা। অতগুলো ছেলে থাকতো, জায়গাটা দারুণ জমজমাট ছিল! অনুপম তো নেই-ই, ওর স্ত্রীও বেরিয়ে গেছে দরজায় তালা বন্ধ।

সুকুমার ফিরেই আসছিল, এই সময় দেখলো একটি লম্বা মতন ছেলে পকেট থেকে চাবি বার করে অনুপমের বাড়ির দরজার তালা খুলছে।

সুকুমারের কৌতূহল হলো। এই ছেলেটিকে সে আগে কখনো দেখেনি।

সুকুমারকে দাঁড়িয়ে পড়তে দেখে ছেলেটিও ফিরে তাকালো। তারপর জিজ্ঞেস করলো, আপনি কাকে খুঁজছেন?

—আমি তো অনুপমকে খুঁজছিলাম।

—উনি তো বর্ডারে গেছেন, আজ ফিরবেন না।

—ও!

—আসুন না, ভেতরে এসে বসুন।

—আপনার নাম কী ভাই?

—লুৎফর। লুৎফর রহমান।

—আমি আগে কয়েকবার এসেছি এখানে। আপনাকে দেখিনি।

—আমি দিন কয়েক হলো এসেছি। আগে অন্য জায়গায় থাকতাম, সেখানে লোক বেড়ে গেছে, তাই অনুপমদা আমাকে এখানে থাকতে দিয়েছেন।

যে ঘরটিতে আগে অন্য সব ছেলেরা থাকতো, সে ঘরে এখনো তালা ও সতরঞ্চি পাতা। সেখানেই অনুপমকে বসালো লুৎফর। ফর্সা ছিপছিপে চেহারা, ঘাড় পর্যন্ত লম্বা চুল, বেশ সুদর্শন ছেলেটি।

ঘরের মধ্যে একটু শীত শীত ভাব। দু একদিন ধরে শীতটা জমিয়ে পড়েছে।

লুৎফর ঘরে ঢুকেই একটা রেডিও চালিয়ে দিল। প্রতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় বিশেষ নিউজ বুলেটিন প্রচারিত হচ্ছে। এখন নতুন কিছু খবর পাওয়া গেল না। যশোর ক্যান্টনমেন্টে দারুণ লড়াই চলছে।

কট্ করে রেডিওটা বন্ধ করে লুৎফর বলল আপনি বসুন দাদা, আমি একটু স্নানটা সেরে নিই।

সুকুমার বললো, আমি এবার উঠি বরং।

—আপনি একটু বসুন না। আমি তো একা আছি, একটু গল্প করা যাবে!

সুকুমারের অবশ্য বিশেষ কোনো কাজ নেই এখন। সেই সন্ধ্যেবেলা মায়াকে দেখতে যাবে।

লুৎফর দু'মিনিটের মধ্যে স্নান সেরে এলো। লম্বা চুলগুলো মুখের ওপর ঝুলে পড়ছে। আপন মনেই সে বললো, একটা চিরুণি, ভেবেছিলাম একটা চিরুণি কিনবো, দূর ছাই, মনেই থাকে না। দেখি বৌদির ঘরে আছে কিনা।

পাশের ঘরে ঢুকে গিয়ে সে একটা বড় সাইজের মেয়েলি চিরুণি

নিয়ে এলো। অবশ্য আজকালকার ছেলেরা যে রকম বড় বড় চুল রাখে, তাতে মেয়েলি চিরুণিতেই তাদের পক্ষে সুবিধে।

তারপর লুৎফর বললো, খুব ক্ষুধা পেয়েছে। দেখি, বৌদি কী রান্না করে রেখে গেছেন ?

রান্নাঘরটি এ ঘরের সঙ্গেই লাগানো। সেখানে ঢুকে পড়ে লুৎফর আবার চেঁচিয়ে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, আপনি খেয়ে এসেছেন। কিছুই খাবেন ?

—না আমি খেয়ে এসেছি।

—আর খাবেনই বা কী ! আছে তো খিচুড়ি। এক দিনের পর দিন খিচুড়ি খেয়ে খেয়ে আর পারি না ! পেটটায় একেবারে চড়া পড়ে গেল। কবে যে চাট্টি গরম ভাত, আর ডাল ঘি দিয়ে মেখে খাবো। সঙ্গে কয়েকখানা ইচা মাছ ভাজা…। দাদা, আমি ডিম ভাজা করছি, আপনি একটা ডিম ভাজা খান অন্তত।

—না ভাই, আমি এখন কিছুই খাবো না।

বেলা তিনটে বাজে। ছেলেটি এতক্ষণ না খেয়ে আছে। ক্ষিধের চোটেই বোধ হয় সে খুব তাড়াতাড়ি খাবার শেষ করে এলো।

—দাদা, আপনার কাছে সিগ্রেট আছে ?

লুৎফরের ব্যবহারের মধ্যে কোনো আড়ষ্টতা নেই, খুব সহজ ভাবে সে নতুন চেনা মানুষের সঙ্গেও কথা বলতে পারে।

সতরঞ্চির ওপর শুয়ে পড়ে বেশ আরাম করে সিগারেট টানতে লাগলো লুৎফর।

সুকুমারের একটু খট্‌কা লাগলো। এর বয়েসী সব ছেলেরা যুদ্ধ করতে চলে গেছে, কেউ বা আহত হয়েছে, কেউ কেউ মারাও গেছে, আর যুদ্ধের এই চরম সময়ে লুৎফর একা একা এখানে রয়ে গেছে কেন !

এ কথাটা সে মুখ ফুটে জিজ্ঞেস করেই ফেললো।

লুৎফর হাসতে হাসতে বললো, দাদা যুদ্ধ মানে কি শুধু বন্দুক

নিয়ে লড়াই ? যুদ্ধের সময় আরও অনেক রকম কাজ থাকে। ধরে নেন, সেরকমই কিছু একটা কাজ আমি করছি।

—কী কাজ ?

—সেটা বলা এখন নিষেধ আছে। আপনাকে দেখে আমি প্রথমে একটু ভয়ই পেয়ে গিয়েছিলাম। দুপুরবেলা, ফাঁকা বাড়ি. ভাবলাম, আমাকে কেউ মেরে ফেলে দেবার জন্য এসেছে নাকি।

- তোমাকে মারবে কেন ? কে মারবে ?

—তার কি কোনো ঠিক আছে। কত রকম স্পাই ঘোরাফেরা করছে !

—স্পাই ? কাদের স্পাই ?

—পাকিস্তানের স্পাই !

—পাকিস্তানের স্পাই তোমাকে মারবে কেন ? তুমিও তো পাকিস্তানের লোক !

—আমি পাকিস্তানের লোক ? দাদা, আপনি ভুলে গেছেন যে বাংলাদেশ এখন একটা স্বাধীন আলাদা দেশ। কয়েকটি রাষ্ট্র আমাদের বাংলাদেশকে স্বীকৃতিও দিয়েছে।

সুকুমার লজ্জা পেয়ে গেল। সত্যি সে ভুল করে ফেলেছিল। আসলে এটা ঠিক ভুলও নয়। মনে মনে সে বাংলাদেশই ভাবছে, কিন্তু মুখে বলে ফেলেছে পাকিস্তান। অনেকদিনের অভ্যেস তো।

সে বললো, কিন্তু পাকিস্তানের স্পাই কলকাতায় আসবে কী করে ?

—আপনি ভাবছেন এখানে পাকিস্তানের স্পাই নেই ? গিস্-গিস্ করছে। নইলে কলকাতার খবরের কাগজে কী বেরুচ্ছে না বেরুচ্ছে তা সেইদিনই সকালে করাচী রেডিও থেকে প্রচার হয় কী করে ? এদিককার বর্ডারের সব খবরও ওরা জানে। আমাদের অস্থায়ী সরকারের দু'জন কর্মীকে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। অনেকের ধারণা পাকিস্তানের স্পাইরা তাদের গুম করেছে।

সুকুমার বললো, ওরে বাবা! এ সব তো জানতাম না।

—আপনাকে বললাম না, যুদ্ধের সময় বন্দুকের লড়াই ছাড়াও আরও অনেক ব্যাপার থাকে!

—আচ্ছা ভাই, বাংলাদেশ মিশনে তোমার চেনাশুনো আছে নিশ্চয়ই। আমার একটা দরকার ছিল।

—কী দরকার বলুন।

—আমার বাড়িতে তোমাদের মুক্তি বাহিনীর একটি ছেলে অসুস্থ অবস্থায় আছে।

জিয়া তো?

—তুমি জানলে কী করে?

—আমাদের খবর রাখতে হয়।

—যাক, নিশ্চিন্ত হওয়া গেল, আমি ভেবেছিলাম, কোনো খবর দেওয়া হয়নি। তুমি চেনো জিয়াকে?

—খুব ভালোই চিনি। ওকে বলবেন আমার নাম, লস্কর রহমান, ও ঠিক বুঝবে।

—সেই তো মুস্কিল, ও এখন কিছুই বুঝছে না। আমাদের কোনো কথার উত্তর দেয় না। নিজেও কোনো কথা বলে না—ডাক্তারবা চিকিৎসা করছেন অবশ্য, কিন্তু আমরা ভয় পেয়ে যাচ্ছি।

—আপনাকে একটা কথা বলবো, সুকুমারদা? ওকে দু' চার ঘা চড় চাপড় দিন তো খুব জোরে, দেখবেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

—যাঃ, তা কি হয়! বড় ডাক্তাররা দেখছেন, কিছু হচ্ছে না।

—অনেক সময় আচমকা আঘাত দিলে কাজ হয়। যাকগে, বাংলাদেশ মিশনকে আপনি কী জানাতে চান? ওকে সরিয়ে নিতে হবে? আপনার অসুবিধে হচ্ছে?

—না, না, আমাদের কিছুই অসুবিধে নেই। আমি শুধু ভাবছি, তোমাদের যদি আরো ভালো কিছু চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকে।

—দেখুন দাদা, আপনাকে একটা কথা বলি। জিয়াটা ভাগ্যবান, যে আপনাদের বাড়ির মতন কোনো প্রাইভেট বাড়িতে আশ্রয় পেয়েছে। সেখানে ও স্নেহ, মমতা, যত্ন পাবে। হাসপাতালে হাজার হাজার রুগীর সঙ্গে থাকার চেয়ে এই ব্যবস্থা হাজার গুণ ভালো।

এতেও যদি সুস্থ না হয়, তা হলে ঐ বাস্কেলটার আর কোনো আশা নেই।

—তুমি জিয়ার সঙ্গে দেখা করবে? যদি তোমাদের দেখে ও কিছু বলে…

লুৎফর তড়াক করে উঠে পড়ে হাতঘড়ি দেখলো। তারপর বললো, হ্যাঁ। যেতে পারি। আমি গিয়ে সত্যিই ওকে দু'খানা চড় কষাবো ঠিক। কিন্তু তার আগে যে আমায় আর এক জায়গায় যেতে হবে? এক কাজ করলে হয় না? আপনিও চলুন আমার সঙ্গে, আমি কাজ সেরে নেবো, আপনি একটু বসবেন। তারপর আপনার সঙ্গেই যাবো আপনার বাড়িতে?

—খুব বেশী দেরী হবে না তো? আমাকে আবার নার্সিং হোমে যেতে হবে।

—নার্সিংহোমে আবার কী ব্যাপার?

—আমার স্ত্রী আছেন সেখানে।

—আপনার স্ত্রী নার্সিংহোমে আর বাড়িতে আপনি জিয়ার মতন একজন অসুস্থ ছেলেকে রেখেছেন?

উত্তর না দিয়ে সুকুমার হাসলো। লুৎফরও হাসলো সুকুমারের চোখের দিকে চেয়ে। সেই হাসিতে অনেক কথা হয়ে গেল।

রাস্তায় বেরিয়েই লুৎফর একটা ট্যাক্সি ডাকলো। সেটায় উঠতে উঠতে সে সুকুমারকে বললো, ভাড়াটা কিন্তু আপনাকেই দিতে হবে। দেখুন না, আপনার বাড়িতে গিয়ে আজই আমি সারিয়ে তুলবো জিয়াকে।

মৌলালির কাছে একটা বাড়ির সামনে থামলো ট্যাক্সিটা। বিরাট বড় ফ্ল্যাট বাড়ি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুকুমার সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগলো লুৎফরের সঙ্গে। একতলা, দোতলা, তিনতলা পেরিয়ে ওরা উঠে এলো পাঁচতলার ওপরে, ছাদে। মস্ত বড় ছাদ, সেখানে টিন আর দর্মা দিয়ে কয়েকটি অস্থায়ী ঘর বানানো হয়েছে, সেই ঘরগুলোতে রয়েছে সাত আটটি ছেলে আর নানা রকমের যন্ত্রপাতি, তিনটে টেলিফোন আর দুটো ওয়্যারলেস সেট। ছেলেগুলি খুব ব্যস্ত, অনবরত টেলিফোন বাজছে, ওয়্যারলেস সেটে ঘর্ঘর শব্দ হচ্ছে, একটি ছেলে কিছু একটা খবর পাঠাচ্ছে মন দিয়ে।

লুৎফর বললো, এটা আমাদের একটা গুপ্ত আস্তানা। আপনি নিজেদের লোক বলে আপনাকে নিয়ে এলাম, বাইরের কাউকে কিছু বলবেন না!

সুকুমার বললো, সে তো নিশ্চয়ই!

লুৎফর ছাদে একটা বেঞ্চির ওপর সুকুমারকে বসিয়ে একটা ঘরে ঢুকে গেল। খানিকটা বাদেই তো ঘর থেকে বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, দাদা, চা খাবেন?

সুকুমার বললো—না!

—আমার ঠিক আধঘণ্টা লাগবে এখানে। আপনি একটু বসতে পারবেন?

—হ্যাঁ, বসছি।

—দাদা, খবর খুব খারাপ। সেভেন্‌থ ফ্লিট এগিয়ে আসছে। আর আমাদের কোনো উপায় নেই।

—এ খবর তো আগেই শুনেছি।

—এখন ব্যাপারটা অনেক সীরিয়াস। ইণ্ডিয়ান ওশান থেকে বে অফ বেঙ্গলে ঢুকে পড়েছে সেভেন্‌থ ফ্লিট। চট্টগ্রামের দিকে এগিয়ে আসছে। মার্কিন সেভেন্‌থ ফ্লিটের সাহায্য পেলে আর পাকিস্তানীদের হারানো অসম্ভব।

—সেভেনথ ফ্লিটের কথা তো আগে থেকে জানাই ছিল। ইন্দিরা গান্ধী কিছু একটা ব্যবস্থা করে রেখেছেন নিশ্চয়ই।

—দাদা, সেভেনথ ফ্লিটের সঙ্গে কি আর ইণ্ডিয়ান আর্মি টক্কর দিতে পারবে? মার্কিনরা এমন ভাবে বিট্রে করলো আমাদের!

—এদিকে রাশিয়া আছে। রাশিয়া কি এমনি এমনি ছেড়ে দেবে ভাবছো? রাশিয়া ঠিক একটা কিছু পাল্টা ব্যবস্থা নেবে।

সে তো আরও সবনাশের কথা। রাশিয়া আর আমেরিকা যদি এখানে যুদ্ধে নেমে পড়ে তাহলে আমাদের দেশটা আর একটা ভিয়েৎনাম হয়ে উঠবে। সে যুদ্ধ কতদিন চলবে কে জানে। দেশটা ছারখারে যাবে তা হলে। আপনাদের ভারতও তখন বাদ পড়বে না।

—ইতিহাসের যা নিয়তি তাই হবে। তুমি আমি তো আর ইতিহাস বদলাতে পারবো না!

লুৎফর ঢুকে গেল আর একটা ঘরের মধ্যে। সুকুমার দেখতে পাচ্ছে যে সে একটা ওয়্যারলেস সেট নিয়ে কানে হেড ফোন লাগিয়ে বসেছে।

খানিকক্ষণ পর আরও পাঁচজন ছেলে মেয়ে উঠে এলো ওপরে। তাদের কথাবার্তা শুনে ঘর থেকে বেরিয়ে এলো কয়েকজন। দুটি মেয়ে আর একটি ছেলে একটি টুলের ওপর বসলো, অন্যরা তাদের ঘিরে উত্তেজিত ভাবে কথাবার্তা বলতে লাগলো। একটি মেয়ে কেঁদে ফেললো হঠাৎ।

সুকুমার কৌতুহলী হয়ে কাছে এগিয়ে গিয়ে একজনকে জিজ্ঞেস করলো, কী হয়েছে ভাই?

সে ছেলেটি সন্দেহভরা চোখে আপাদ মস্তক একবার দেখে নিয়ে বললো। আপনি কার সঙ্গে এখানে এসেছেন?

—লুৎফর রহমানের সঙ্গে।

—ও। এই তিনজন ঢাকা থেকে এসেছে। সোজা পায়ে হেঁটে। কাল রাত্তিরেই পৌঁছেচে।

—এই যুদ্ধের মাঝখান দিয়ে ওরা এলো কী করে ?

—আসছে, এরই মধ্যে আসছে। ওদের কাছ থেকে রাস্তার খবর পাওয়া যাবে অনেক। সেইজন্যই এখানে এসেছি।

একটা মেয়ে কথা বলতে গিয়েই কেঁদে ফেলছে। ওরা খান সেনার নজরে পড়েনি। কিন্তু রাস্তায় চোর-ডাকাত বদমাস লোকেরা ওদের ওপর অনেক রকম অত্যাচার করেছে। অন্য মেয়েটি গম্ভীর। ছেলেটি কিন্তু হাসছে।

সুকুমার একটা ব্যাপার জেনে অবাক হয়ে গেল। ছেলেটি হিন্দু, মেয়ে দুটি ওর বোন। ছেলেটি ছিল ঢাকায়, মেয়ে দুটি নারায়ণগঞ্জের কাছে এক গ্রামে।

সুকুমার জিজ্ঞেস করলো, আপনি ভাই এতদিন ঢাকায় ছিলেন কী করে ?

ছেলেটি উত্তর দিল যে তার এক মুসলমান বন্ধু তাকে আশ্রয় দিয়েছিল। এত বিপদের মধ্যেও বন্ধুটি ভয় পায় নি। বেশ বিপদেই ছিল ছেলেটি। তাতে তার সাহস বেড়ে যায়। গতমাসে একদিন সাহস করে একটু বাজারে বেরিয়েছিল, ঠিক সেই সময় খান সেনারা বাজার ঘেরাও করে সবাইকে ধরে ফেললো।

—তারপর আপনি ছাড়া পেলেন কী করে ?

—ছাড়া কি আর পেতাম। বুকের সামনে মেশিনগান তুলেছিল। চোখ বুজে তখন ভগবানকে ডাকছি। যদিও জানি, ভগবানও আজকাল ডাক শুনলে সাড়া দেয় না।

—কী হলো তখন ?

—খান সেনারা প্রত্যেকের নাম জিজ্ঞেস করছে। আমার বুকের সামনে মেসিনগান, কোনো মিথ্যে নাম মুখে এলো না। যদিও হিন্দুর নাম শোনা মাত্র ওরা গুলি করে। তবু নিজের নামটাই বলে দিলাম।

—তারপর ?

—বেঁচে গেলাম ঐ নামের জোরেই. আমার নাম বিহারীলাল সিংহ। নাম শুনেই খান সেনারা বললো, তুম বিহারী? ঠিক হ্যায়, চলা যাও!

অমনি একটা হাসির ধুম পড়ে গেল। একজন বললো, ব্যাটাদের মাথায় গোবর পোরা।

বিহারীলাল বললো, ঐ গোবরের জন্যই তো বেঁচে গেলাম!

লুৎফর বেরিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলো, আপনার ঢাকা থেকে আসবার পথে প্রথম নদী পেরুলেন কোথায়।

—আরিচা ঘাটে।

—সেখান থেকে এখনো পার হওয়া যায়? খানসেনারা পাহারা দিচ্ছে না?

—আছে পাহারা। আলু পেঁয়াজের বস্তা ভরা নৌকো পার হচ্ছিল, সেই নৌকোয় লুকিয়ে ছিলাম।

—সেই নৌকো সার্চ করে নি?

—না।

লুৎফর একজনের দিকে ফিরে বললো, এনাদের পুরো রুটটা নোট করে নাও শুনে শুনে। কোনো ডিটেল্স যেন বাদ না যায়। আমি রাত্তিরে এসে দেখবো। চলুন, সুকুমারদা!

সিঁড়ি দিয়ে নামতে নামতে সুকুমার বললো, তোমাদের এখানে এলে অনেক রকম ঘটনা জানা যায়।

—আসবেন মাঝে মাঝে।

—ছেলেটি কী আশ্চর্য উপায়ে বেঁচে গেছে!

—যুদ্ধে এরকম হয়। আবার যার মরার কোনো কথাই নয়, সেও হঠাৎ মরে যায়। আমাদের কত ভালো ভালো ছেলে সামান্য ভুলের জন্য প্রাণ দিয়েছে।

বাড়ি পৌঁছোবার পর দরজা খুলে দিলেন বিনতা দেবী। লুৎফর তাঁকে সুকুমারের মা ভেবে নিয়ে টিপ করে এক প্রণাম করে

ফেলে বললো, মাসীমা, আমি আপনার আর এক ছেলে। আমার নাম লুৎফর।

বিনতা দেবী চমকে একটু পিছিয়ে গেলেন।

সুকুমার মনে মনে প্রমাদ গুণলো। বিনতা দেবী যদি এর সঙ্গে রূঢ় ব্যবহার করেন, তাহলে লজ্জায় তার মাথা কাটা যাবে।

লুৎফর বললো, মাসীমা, এক কাপ খুব ভালো চা খেতে চাই। তিন চামচ চিনি!

বিনতা দেবী অবশ্য কোনো কটূক্তি করলো না। ফ্যাকাসে ভাবে হেসে বললেন, আচ্ছা, দিচ্ছি চা।

সুকুমার তাড়াতাড়ি বললো, চলো, আগে জিয়াকে দেখে আসি।

জিয়ার ঘরের দরজা ভেজানো। ছাদের অফিসের কাছে দাঁড়িয়ে আছে সুলেখা। বিষণ্ণ, উদাসীন মুখ। বিকেলের দিকে এরকম মুখের ভাব হলে মেয়েদের বেশী সুন্দর দেখায়।

সুকুমার সুলেখাকে ডেকে তার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিল লুৎফরের। তিনজনে জিয়ার ঘরে ঢুকলো।

জিয়া ঘুমিয়ে আছে।

লুৎফর পা টিপে টিপে তার কাছে গিয়ে কানের কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে বিকট ভাবে 'হালুম' বলে চিৎকার করে ওঠলো।

জিয়া তাতেও চমকে ওঠলো না। চোখ মেললো আস্তে আস্তে। নিষ্প্রাণ দৃষ্টি।

—এই জিয়া, ওঠ! আমি লুৎফর।

তবু কোনো উত্তর নেই।

—কী রে। আমাকে চিনতে পারছিস না?

সুকুমার বললো, ও এখন আমাদেরও কারুকে চেনে না।

লুৎফর জিয়ার জামা চেপে ধরে এক হ্যাঁচকা টানে তাকে উঠিয়ে বললো, কী রে স্টুপিড! ন্যাকামি করছিস আমার সঙ্গে?

এরপর সে ঠাসঠাস করে চড় মারলো জিয়ার দু'গালে।

সুলেখা বললো, ও কি! মারছেন কেন শুধু? ডাক্তার বলে গেছেন, মারধোর করে কোনো লাভ নেই। ওতে আরও খারাও হয়।

লুৎফর কয়েক মুহূর্ত সুলেখার দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে থেকে আস্তে আস্তে বললো, দিদি,'আপনার মত কেউ যদি আমাকে এরকম দু'একটা স্নেহের কথা বলতো, আমি ধন্য হয়ে যেতাম। খান সেনারা আমাদের বাড়িতে আগুন লাগিয়ে দিয়েছিল। আমাদের বাড়ি খুলনায়। আগুন লাগার পর আমি বাড়ি থেকে দৌড়ে বেরিয়েছিলাম, তখন ওরা আমায় গুলি করে। গুলি লেগেছিল আমার বাম উরুতে, আমি মাটিতে পড়ে ছট ফট করছিলাম। সেই অবস্থায় আমার মনে পড়েছিল যে আমার বাবা রয়েছেন বাড়ির মধ্যে। বাবাকে বাঁচাবার জন্য আমি চিৎকার করছিলাম, কেউ ধারে কাছে এগোয় নি। আমার বাবা অসুস্থ ছিলেন, তিনি বেরুতে পারলেন না। বলতে গেলে আমারই চোখের সামনে আমার বাবা পুড়ে মরলেন। কই, আমি তো পাগল হইনি? আমার তো কথা বন্ধ হয়ে যায় নি। আমি তো শখ করে বিছানায় শুয়ে থাকি না!

সুকুমার বললো, তবু...মানে, সকলের তো মনের জোর একরকম হয় না?

—আমি চাই প্রতিশোধ! প্রতিশোধ! সেই আগুন আমার বুকের মধ্যে জ্বলছে সব সময়।

সুকুমার অবাক হয়ে গেল। এতক্ষণ তার এই ছেলেটিকে যেন হাসি খুশী স্বভাবের মনে হচ্ছিল।

লুৎফর জ্বলন্ত চোখে সুলেখার দিকে তাকিয়ে বললো, দিদি, আপনি একটু বাইরে যান। আমার নিজস্ব উপায়ে একটু জিয়ার চিকিৎসা করে দেখবো।

সুলেখা বললো, সে জন্য আমাকে বাইরে যেতে হবে কেন?

—আমি এমন কিছু কথা বলবো। যা আপনি সহ্য করতে পারবেন না।

– হ্যাঁ পারবো।

—আপনার কষ্ট হবে, আপনার নরম মন।

—বলছি তো পারবো!

লুৎফর আবার জিয়াকে একটা ঝাকানি দিয়ে বললো। এই জিয়া, রাস্কেল, শোন! তোর মিনু আপাকে মনে আছে? সফিকল আলমের বড় বোন মেহেরুন্নিসা, যাকে সবাই আমরা মিনু আপা বলতাম?

জিয়া একই রকম নিঃশব্দ হয়ে বসে রইলো।

লুৎফর বললো, বুঝলেন সুকুমারদা, মিনু আপাকে আমরা সকলে শ্রদ্ধা করতাম। যেমন সুন্দর চেহারা, তেমন গুণ। ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে ইতিহাস পড়াতেন। হিস্ট্রিতে ফার্স্ট ক্লাস ফার্স্ট। কতলোক ওনাকে বিয়ে করার জন্য পাগল ছিল। উনি বিয়ে করেন নি, ফরেনে ছিলেন অনেক দিন। ফিরে এসে সাত আটটি গরীব দুঃখী ছেলেকে নিজের বাড়িতে রেখে মানুষ করছিলেন। সেই মিনু আপা একদিন উধাও হয়ে গেলেন। এটা আপনার এপ্রিল মাসের ঘটনা। সাতদিন পর মিনু আপার খোঁজ পেলাম আমরা। ওর প্রাণহীন শরীরটা পড়ে আছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে একটা ঝোপের পাশে, সম্পূর্ণ উলঙ্গ, সারা গাটা ক্ষত বিক্ষত, মনে হয় যেন কোন হিংস্র পশু আঁচড়ে কামড়ে খেয়েছে! আসলে হিংস্র পশু একটা নয়, অন্তত আট দশজন মিলে মিনু আপার ওপর অত্যাচার করে তারপর ওনার প্রাণহীন দেহটা ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে মাঠের মধ্যে। মিনু আপা যাকে আমরা সবাই অন্তরের থেকে শ্রদ্ধা করতাম, তাঁর এই অবস্থা দেখলে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে ওঠে না? মনে হয় না, প্রতিশোধ! প্রতিশোধ না নিতে পারলে আমি পুরুষ মানুষই না? কি রে জিয়া। তোর মনে হয় না!

জিয়ায় চোখ থেকে দু' ফোটা জল গড়িয়ে পড়লো। কিন্তু কোনো কথা বললো না সে।

কথা বলতে বলতে লুৎফর হাঁপাচ্ছে। যেন সে চোখের সামনে এখনো দেখতে পাচ্ছে সেই বীভৎস দৃশ্য।

সে আবার বললো, মিন্নু আপা তো তবু যুবতী মেয়ে ছিলেন। আর একটা কথা শুনলে আপনারা আরও অবাক হয়ে যাবেন। আকবরের নানী, তার বয়েস বিরাশী, থুরথুরে বুড়ি যাকে বলে। সেই আকবরের নানীকেও খান সেনারা একদিন পুকুর পাড় থেকে ধরে নিয়ে যায়। তার ওপরেই পশুর মত অত্যাচার করে মৃতদেহটা ফেলে দেয়। শিয়াখালা গ্রামে খান সেনারা ঢুকে সে গ্রামের নয় থেকে নব্বুই বছর পর্যন্ত সমস্ত মেয়েছেলেদের ধরে নিয়ে গিয়ে তারা অত্যাচার করে। প্রতিশোধ নিবি না জিয়া? ভীরুর মতন শুয়ে থাকবি?

সুকুমার বললো, জিয়াও তো ওর যথাসাধ্য যুদ্ধ করেছে!

লুৎফর প্রায় এক ধমক দিয়ে বললো, আপনি চুপ করে থাকুন! তারপর ডক্টর দেব? ঋষিতুল্য মানুষ, ফিলজফিতে বিরাট পণ্ডিত, পোষ্যপুত্র নিয়েছিলেন একটি মুসলমান ছেলেকে, সেই ডক্টর দেবকে কী বীভৎস ভাবে মেরেছে? প্রোফেসার গুহঠাকুরতাকে? শুধু একা জিয়ার দাদা মারা গেছে? সবাই যদি এখন ঘরে বসে কাঁদে, তাহলে যুদ্ধটা চলবে কাদের নিয়ে?

জিয়া আবার চুপ করে শুয়ে পড়লো।

হাল ছেড়ে দিয়ে লুৎফর বললো, নাঃ, আমি পারলাম না। রোগের সঙ্গে লড়াই করা আমার সাধ্যে কুলোবে না।

॥ ৯ ॥

সুকুমার খেয়ে-দেয়ে একটু বেরিয়েছে। বিনতা দেবী গেছেন মায়ার খাবার নিয়ে। মায়া আর ছু'এক দিনের মধ্যেই সন্তান নিয়ে বাড়ি ফিরে আসবে।

সুলেখা জিয়ার জন্য খাবার তৈরী করে ওপরে নিয়ে গেল। জিয়া কিছুই খেতে চায় না। সুকুমার আর সুলেখা তাকে জোর করে খাওয়ায়। পাতলা ভাত ঝোল দিয়ে মেখে চামচে করে মুখে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়। অবুঝ শিশুর মতন জিয়া মুখ থেকে খাবারটা বের করে দেবার চেষ্টা করে। তখন সুলেখা তাকে ধমকায়। অনুনয় বিনয় করে।

এ-রকম ভাবে আর বেশীদিন চলবে না। কাল রাত্তিরেই সুকুমার বলছিল, ডাক্তাররা পরামর্শ দিচ্ছেন জিয়াকে কোনো মানসিক হাসপাতালে পাঠাবার জন্য। বাড়িতে আর ঠিক মতন চিকিৎসা হচ্ছে না। সুলেখার মন তাতে সায় দেয় না, অথচ উপায়ই বা কী?

সেদিনও সুলেখা জোর করে তার মুখ ঘুরিয়ে খাবার খাইয়ে দিল। আজ আরও কম খাবার খেল জিয়া। খাবারটা মুখে দিলেই মুখ বিকৃত করে ফেলে। এই ক'দিনই বেশ রোগা হয়ে গেছে ছেলেটা। সুলেখা অনেক বুঝিয়ে-সুঝিয়ে, বকুনি দিয়েও তাকে পুরোটা খাওয়াতে পারল না। তখন সে খুব অসহায় বোধ করল। এর চেয়ে বোধ হয় হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়াই ভাল। সেখানে নার্সরা ঠিক মতন খাওয়াতে পারবে। সুলেখা তো আর পারছে না কিছুই। সে তো এসব জানে না।

খাওয়া কোনক্রমে শেষ হতেই জিয়া আবার ধপ করে শুয়ে পড়ল।

সুলেখা আরও কিছুক্ষণ বসে রইল সেখানে। তার খিধে পেয়েছে, তবু এক্ষুনি নীচে যেতে ইচ্ছে করছে না। টেবিল থেকে সে জিয়ার কবিতার 'খাতাটা টেনে নিয়ে পাতা উল্টে দেখতে লাগল। জিয়ার হাতের লেখা খুব সুন্দর। কয়েকটা বানান ভুল আছে অবশ্য। তা ছাড়া সে সত্তরকে সত্তুর, কোনোদিনকে লেখে কুনোদিন।

পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে সুলেখা শেষ কবিতায় এসে থামল। ওই কবিতাটা জিয়া যেদিন লিখছিল, সেদিন সুলেখা হঠাৎ এসে পড়ায় জিয়া লজ্জা পেয়েছিল।

কবিতা কয়েকবার পড়ে পড়ে সুলেখা মানে বোঝাবার চেষ্টা করল। এমন সময় দরজার কাছে একটা ছায়া পড়ল। সুলেখা দেখল, তার মা।

সুলেখার মুখটা কঠিন হয়ে এল। বিনতা দেবী কোনদিন ওপরে আসেন না। জিয়ার সঙ্গে তিনি একদিনও একটা ভাল করে কথা বলেন নি।

বিনতা দেবী কখন যে নার্সিং হোম থেকে ফিরে এসেছেন, সুলেখা টেরও পায় নি।

বিনতা দেবীর হাতে একটা পাথরের বাটি। তিনি মেয়ের মুখের দিকে কয়েক পলক তাকিয়ে রইলেন। তারপর আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন, ও এখনো কথা বলে না?

সুলেখা সংক্ষেপে জানাল, না!

—সুকুমার বলছিল, ওকে নাকি হাসপাতালে দেবে?

সুলেখা আরও কঠিন হয়ে বলল, এখনো কিছু ঠিক নেই।

—তুই উঠে আয় ওখান থেকে।

—কেন।

—বলছি, উঠে আয় না।

—সুলেখা তার মায়ের সঙ্গে ঝগড়া করার জন্য তৈরি হলো। মা কেন এমন সংস্কারের পরিচয় দেবেন!

বিনতা দেবী বললেন, বিদেশ বিভুঁয়ে ছেলেটা একলা হাসপাতালে পড়ে থাকবে, সেটা মোটেই ভাল কথা নয়। আমি খানিকটা শতমূলী আর চন্দন বেটে এনেছি, এটা একটু কপালে আর পেটে লাগিয়ে ছাখ না। শুনেছি এতে অনেক কাজ হয়।

সুলেখা যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। জিয়ার জন্য নিজের হাতে ওষুধ বেটে এনেছেন। উনি তো প্রথম থেকেই জিয়াকে অপছন্দ করেছিলেন।

বিনতা দেবী ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে বললেন, তুই সর, আমি লাগিয়ে দিচ্ছি। তিনি জিয়ার কপালে মোটা করে লেপে দিলেন সেই শতমূলী আর চন্দনের প্রলেপ। তারপর গেঞ্জিটা সরিয়ে নাভির কাছেও লাগাতে লাগলেন। আর মুখে বলে যেতে লাগলেন, আহারে, ছেলেটা মোটে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ওর দাদাকে পেল না! এত কষ্ট করে, এতদিন পরে, মোটে পাঁচ মিনটের জন্য···এ কি কম দুঃখু···এ দুঃখু কি জীবনে যাবে? ওর বাপ মা কোথায় আছে, কতদিন দেখে নি···তারা এখনো জানে না, কিন্তু না জানলে কি হবে মায়ের প্রাণ ঠিক আনচান করছে ··দু'দিন বাদে সব ছেলে যখন দেশে ফিরবে. ওর মাও তো ছেলেকে খুঁজবে···ছেলেকে না পেয়ে মায়ের প্রাণ—

জিয়া মুখ ফিরিয়ে দেখলো বিনতা দেবীকে।

তিনি আরও গরম গলায় বললেন, ভয় নেই, সেরে যাবে, ঠিক সেরে যাবে, আহারে মুখখানা শুকিয়ে গেছে একেবারে, কতদিন মাকে দেখে না···

জিয়া ধড়মড় করে উঠে বসে বলল, মা!

তারপরই সে হাউ হাউ করে কেঁদে উঠে বিনতা দেবীর হাত চেপে ধরল।

বিনতা দেবীও চোখের জল সামলাতে পারলেন না। তিনিও কাঁদতে লাগলেন। জিয়ার মাথায় হাত দিয়ে বলতে লাগলেন, তোমার দাদা নেই, এখন তোমার মাকে তো তুমিই দেখবে—মায়ের প্রাণ ··ওরে বাবা, মায়ের প্রাণে যে কত কষ্ট···সন্তানের জন্য মায়ের···

সুলেখা চোখের জল সামলে তাড়াতাড়ি ঘরের বাইরে বেরিয়ে গেল। সে আর সুকুমারদা যা পারে নি, তার মা তাই পেরেছে। তার মা জিয়ার মায়ের কথা মনে করিয়ে দিয়েছেন দারুণ ভাবে।

জিয়া তখনও বিনতা দেবীর হাত জড়িয়ে ধরে বলে যাচ্ছে, মা, মা, আপনিও আমার মা। আপনি বলুন। আমি আমার মাকে খুঁজে পাবো তো।

পাবি রে, নিশ্চয়ই পাবি। আমি বলছি সব ঠিক হয়ে যাবে।

বিনতা দেবী ঘর থেকে বেরিয়ে আসতেই সুলেখা তাঁকে জড়িয়ে ধরে বললো, মা, মা, তুমি দারুণ কাজ করেছো। তুমি অসাধ্য সাধন করেছো, তুমি এতো ভালো মা···এক্ষুনি সুকুমারদাকে খবর দিতে আমি টেলিফোন করতে যাচ্ছি···

সেদিন সন্ধ্যেবেলা জিয়া নিজেই উঠে বসে খাবার খেল। কথা বেশী বলে না অবশ্য, সব সময় কাঁদে। সুকুমার নীচ তলা থেকে রেডিওটা এনে রাখল জিয়ার ঘরে। রেডিওতে আধ ঘণ্টা অন্তর অন্তর নতুন খবর আসছে। অবশেষে শোনা গেল, ভারতীয় সেনা ও মুক্তিবাহিনীর যৌথ ফ্রন্ট ঢাকায় ঢুকে পড়েছে, সেখানে পথে পথে যুদ্ধ চলছে।

পরদিন খুব সকালবেলা অনুপম আর তাঁর স্ত্রী শান্তা এসে হাজির। সুকুমারকে ঘুম থেকে ডেকে তুলে জিজ্ঞেস করল, জিয়া কেমন আছে রে?

সুকুমার একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বলল, কাল থেকে একটু ভাল আছে। কিন্তু তুই তো এর মধ্যে একবারও দেখতে এলি না।

অনুপম কটমট করে তাকাল সুকুমারের দিকে। তারপর কঠোরভাবে বলল, আমাকে শুধু জিয়া নয় আরও অনেকের খবর রাখতে হয়। তুই জানিস আতাউর মারা গেছে?

সুকুমার স্তম্ভিত ভাবে বলল, আতাউর? তার মানে আতা! সেই হাসিখুশী ছেলেটা?

—হ্যাঁ!

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুকুমার বলল, অনুপম, তুই এ খবরটা জিয়াকে এখন দিস না। ও এখনো ওর দাদার মৃত্যুর শোকটাই সহ্য করতে পারে নি পুরোপুরি—

অনুপম ধমক দিয়ে বলল, সে কথা তোকে শেখাতে হবে না! আমি জানি কাকে কি বলতে হয়! চল, জিয়াকে একবার দেখে আসি!

শান্তা তার স্বামীকে বলল, আঃ, তুমি সবাইকে অত ধমকে কথা বলছ কেন? আজ কি রাগারাগি করার দিন!

সুকুমারের দিকে ফিরে বলল, আপনি কিছু মনে করবেন না। প্রায় তিন রাত্রি ওর ঘুম হয়নি, তাই মেজাজ ঠিক নেই।

অনুপম বলল, চল, ছেলেটাকে দেখে আসি!

জিয়াও তখনো ঘুমোচ্ছিল, অনুপম দরজায় ধাক্কা দিয়ে তাকে জাগাল। দরজা খুলেই জিয়া বলল, অনুপমদা? শান্তা বৌদি!

তার গলার আওয়াজ স্বাভাবিক সুস্থ লোকের মতন। কিন্তু পরক্ষণেই তার চোখ জলে ভরে এল—

অনুপম কড়া গলায় বলল, ঠিক আছে! এখন তো ভালই আছো দেখছি! এখন আর অত কান্নাকাটির দরকার কি। আচ্ছা আমি চলি।

জিয়া বলল, অনুপমদা, আমার বড় ভাই···

তাকে থামিয়ে দিয়ে অনুপম বলল, আমি জানি, তোমার দাদা আজিজুল বীরের মতন যুদ্ধ করতে করতে প্রাণ দিয়েছে! তার জন্য আজ কান্নাকাটি করার কি আছে? এটা মনে রেখো, আজিজুলের মতন আরও অনেকের ভাই, দাদা, বাবা এই যুদ্ধে প্রাণ দিয়েছে! তারা সবাই মিলে যদি আজ কাঁদতে শুরু করে, তাহলে আজকের স্বাধীনতাটা আসবে শোকের মধ্য দিয়ে। কিন্তু স্বাধীনতা সব সময়েই আনন্দের, উৎসবের। কিছু লোকের আত্মত্যাগ ছাড়া স্বাধীনতা আসে না। ঠিক আছে, চলি!

সুকুমার বলল, এত ব্যস্ত হয়ে চললি কোথায়? চা খাবি না?

—না, সময় নেই। এক্ষুনি বাংলাদেশ মিশনে যেতে হবে। আর কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই জেনারেল নিয়াজী ঢাকায় আনুষ্ঠানিক-ভাবে আত্মসমর্পণ করবে। এর মধ্যেই, স্বাধীন সরকার প্রতিষ্ঠিত হচ্ছে বিভিন্ন জায়গায়। একটা দল আজই সাতক্ষীরায় গিয়ে বাংলা-দেশের জাতীয় পতাকা উড়িয়ে স্বাধীন সরকারের কাজ শুরু করবে। ছেলেরা আমাকে ধরেছে, ওদের সঙ্গে যশোরে যেতে।

জিয়া চেঁচিয়ে উঠল, অনুপমদা, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? যশোরে?

—হ্যাঁ।

—আমিও আপনাদের সঙ্গে যাব! যশোর থেকে মাদারিপুর বেশী দূর নয়, সেখানে গেলে আমি আমার মায়ের দেখা পাব!

অনুপম ঠাট্টা করে বলল, ইস, আর যেন কারুর মা নেই! এক্ষুনি মাকে না দেখলে চলছে না। কবিতা টবিতা লিখলে এরকম দুর্বলই হয়। ঠিক আছে, যদি যেতে চাও, আমি তোমাকে ঠিক দু'মিনিট সময় দিতে পারি, তার মধ্যে যদি তৈরি হয়ে নিতে পার—

সুলেখা বললেন, আমরা যেতে পারি না? সুকুমারদা, আমরা যাবো না?

শিশু সন্তানকে বাড়ি নিয়ে যাচ্ছেন, আমরাও আমাদের শিশু স্বাধীনতাকে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছি।

উত্তর দেবার বদলে সুকুমার হাসল। তারপর হাত নেড়ে বলল আচ্ছা!

সুলেখা বললো, আমার দিদির ছেলের নাম আমি রেখেছি জয়। আজ ১৬ই ডিসেম্বর সে বাড়ীতে আসছে। নামটা কী রকম সার্থক বলুন তো!

ঝট করে গাড়ি থেকে নেমে এল জিয়া।

সুকুমারের সামনে এসে বলল, সুকুমারদা, একটা কথা।

কিন্তু তারপর সে চুপ করে গেল। কী কথা যে সে বলবে, তা ভেবে পেল না। সে কিছু বলতে চায়, কিন্তু ভাষা নেই।

গাড়ির সবাই তাকে তাড়া দিচ্ছে, তাই সে একটু পরে অতিকষ্টে ভাঙা ভাঙা ভাবে বলল, সুকুমারদা, আমি চলে যাচ্ছি···জানি না আর দেখা হবে কিনা···আমাকে আপনাদের মনে থাকবে তো?

শেষ কথাটা সে বলল সুলেখার দিকে তাকিয়ে। সুলেখার বদলে উত্তর দিল সুকুমার। সে আবেগের সঙ্গে বলল, কেন মনে থাকবে না জিয়া? দেখা হবেই বা না কেন? নিশ্চয়ই দেখা হবে।···জিয়া তোমাকে আমরা চিরকাল মনে রাখব···কখনো ভুলতে পারি?··· তুমি তো আমাদেরই একজন···আমরা যাব, তুমি আবার আসবে··· যখন আসবে, সোজাসুজি আমাদের বাড়িতে এসে উঠবে, যে-কোনদিন···আমরা অপেক্ষা করে থাকব···

সুলেখা জিয়ার চোখের দিকে স্থির ভাবে তাকিয়ে ছিল। এক সময় চোখ নামিয়ে নিল। সে কোন কথাই বলতে পারল না। তার চোখ জ্বালা করে কান্না আসছিল। কিন্তু এই মুহূর্তে সে কিছুতেই কাঁদবে না।

জিয়া বললো, আমি আবার আসবো, শিগগিরই আসবো, দেখা হবে, নিশ্চয়ই দেখা হবে। মাকে বৌদিকে আমার নমস্কার দেবেন···

অনুপম জিয়াকে তাড়া দিল।

জিয়া আবার গিয়ে উঠতেই ছেড়ে দিল গাড়িটা। জিয়া ব্যাণ্ডেজ বাঁধা হাতটাই জানলার বাইরে বাড়িয়ে দিয়ে নাড় লাগল—সুকুমারও হাত নাড়তে নাড়তে খানিকটা ছুটে গাড়িটার সঙ্গে—তারপর গাড়িটা বাঁক ঘুরে গেল। সুলেখা জায়গায় স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে।

সমাপ্ত